শ্রীমা-প্রসঙ্গ

ডঃ কে, আর, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার
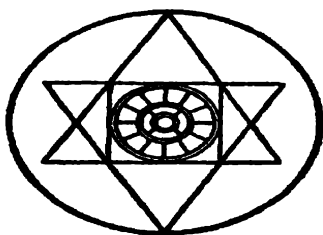
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

শ্রীমার শ্রীচরণে—

"আমার বোধি যদি সীমিত হয়, তারে প্রসারিত কর ;
আমার জ্ঞান যদি তমসাচ্ছন্ন হয়, তারে উদ্ভাসিত কর ;
আমার হৃদয় যদি উদ্দ্যমবিহীন হয়, তারে প্রোজ্জ্বলিত
করে তোল ;
আমার প্রেম যদি তুচ্ছ হয়, তারে প্রগাঢ় করে তোল ;
আমার অনুভূতি যদি অজ্ঞানাচ্ছন্ন ও অহমিকাপূর্ণ হয়,
তারে সত্যের পূর্ণ-চেতনা দাও।"

দু' একটি কথা

বইটি ডঃ কে, আর, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের ইংরাজী বই "অন্ দি মাদার" এর অনুবাদ। এর অধ্যায়গুলি বাংলা ত্রৈমাসিক পত্রিকা "বর্ত্তিকা"য় ধারাবাহিকভাবে "শ্রীমা প্রসঙ্গ" নামে বেরিয়েছিল—এগুলি তারই সংকলন মাত্র।

এ প্রয়াসের পিছনে ছিল শ্রীমার পরম আশীর্ব্বাদ, অশেষ করুণা।

আমার কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রীসমীরকান্ত গুপ্তকে, যার অকুণ্ঠ সহযোগীতা ও অনুপ্রেরণা না থাকলে পুস্তিকাটি অনুবাদ করা সম্ভব হ'ত না। আর কৃতজ্ঞতা জানাই তাদের যারা পুস্তাকাকারে প্রকাশ করায় সাহায্য করেছেন—তারা হলেন শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরের কার্য্য নির্ব্বাহক মণ্ডলী, শ্রীসোমনাথ মুখোপাধ্যায় ও মতী পূর্ণিমা বসু।

অনুবাদক

সূচীপত্র

অধ্যায় পৃষ্ঠা

শ্রীমা প্রসঙ্গ

এক

"তুমি তো শ্রীঅরবিন্দের 'জীবনী' লিখেছ, কেনই বা তুমি শ্রীমায়েরও একটি জীবনী পরিবেশন করবে না।"

এরূপ মৃদু আহ্বান করত, অনুনয় জানাত আভাসে ইঙ্গিতে আমার বন্ধুরা। কিন্তু এ কাজ কি বাস্তবিকই সম্ভব? অসীমের ইতিহাস বা চিরন্তনীর জীবনালেখ্য রচনার প্রচেষ্টা কেউ কি করে? শ্রীমার জীবনী লেখায় সাহস কেউ কি করে? শ্রীমা শুধু মা-ই, এর বেশী তাঁর সম্বন্ধে কেউ জানে বলে ত সন্দেহ হয়।

কিন্তু তবু কেনই বা নয়? একটি শিশু তার ক্ষুদ্র ক্ষীণ দুটি বাহু বাড়িয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে যখন ঘোষণা করে: "অসীম, সে তো এত বড়।" তখন সে-সত্য তার জ্ঞানের পরিমাপে। অল্পতর জ্ঞান বৃহত্তর জ্ঞানের অন্তরায় তো কোনদিনই নয়। ক্ষুদ্রতর যা তা নিজেকেই অতিক্রম করতে পারে কালে এবং বৃহতের কোঠায় পৌঁছাতেও পারে। সত্যের কাঞ্চনজঙ্ঘা একক সরল দ্রুত পদক্ষেপে উত্তীর্ণ হওয়া, হায়, সে আমাদের নয়, তাই আমাদের প্রয়োজন ধীরে সতর্কভাবে উত্তুঙ্গ পাহাড়ের পিচ্ছিল ও খাড়াই গা বেয়ে দুরারোহ মন্থর আরোহণ

পা রেখে শিলাগাত্রের উপর, উৎফুল্ল চোখ রেখে মেঘমুকুট শোভিত শিখরের উপর, অদম্য সংকল্পভরে সাহসের সাথে, হৃতবুদ্ধিতা, ক্লান্তি, সন্দেহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে···।

তা হ'লে মানুষীভাবের দিক থেকে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার জীবনালেখ্য রচনার বাধা নেই। অপরপক্ষে এও হ'বে অপ্রাসঙ্গিক যদি শুধু বাহ্য ঘটনাবলীই বর্ণিত হয়। শুধু নিত্যনৈমিত্তিক খুঁটিনাটি দিয়ে তা পূর্ণ করা হয়, শুধু যদি "ইউক্লিডিয়ান" জগতের ওজন ও মাপকাঠি দিয়ে আলোচনা চালানো হয়। জন্ম, বৃদ্ধি, পরিণতি, শৈশব, কিশোর, নারীত্ব, পূর্ব্বপুরুষের প্রভাব, পারিপার্শ্বিক অবস্থা শিক্ষাদীক্ষার ছাপ,—এ সব সাধারণ শ্রেণীগুলিকে পর্য্যায়ভুক্ত করার সাথে অন্তরাত্মার জীবনের কোনই অচ্ছেদ্য সম্পর্ক নেই। অন্তরাত্মা স্থান কাল অতিক্রম করে চলে, তার নেই আদি, নেই অন্ত; নেই বিকাশ নেই কোন বিশীর্ণতা; এ হিন্দু বা ইউরোপীয় নয়, এমন কি পুরুষ বা নারীও নয়। আত্মা একান্তভাবে সৎ, চিরন্তন ছিল, চিরন্তনই থাকবে।

সিদ্ধার্থ, যিশু, রামকৃষ্ণ, অণ্ডাল, তেরেসা, রাবিয়া: এঁরা সকলেই পুরুষ বা নারী এতে কোন সন্দেহ নেই; তবুও একই দেবত্ব তাঁদের ঘিরে, তাঁরা সকলেই আমাদের সাধারণ বোধ ও অনুভূতিকে ছাড়িয়ে বহু উর্দ্ধে। নিছক মানুষত্ব ত্যাগ করে তাঁরা হয়ে উঠেছেন অসীমের বিভূতি, পূর্ণের রাজদূত, অনন্তের তীর্থযাত্রী। এমন কি সিদ্ধার্থও জন্মেছিলেন, দিনে দিনে সূর্য্যের আলো ও বৃষ্টির ধারার মধ্য দিয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছিলেন,

তিনি ভালবেসেছিলেন, বিবাহ করেছিলেন, তিনিও জেনেছেন প্রচেষ্টা সাফল্য ও নৈরাশ্য। তবুও তাঁর যতকিছু পার্থিব জীবনের তথাকথিত 'ঘটনা' কতই না তুচ্ছ, কতই না নিরর্থক প্রতিবন্ধক মনে হয়। বুদ্ধ বলতে যখন বুঝি এক সমুজ্জ্বল অসামান্যতা, তখন যেটি সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় তা হ'ল বহির্জীবনের যত ঠাসা নক্সার অন্তরালে আছে যে অধ্যাত্ম জীবনের সত্য তারই নিগূঢ় অধ্যাত্ম ইতিহাস, বহির্জীবনের সেসব কাহিনীও স্থান পায় আমাদের অন্তরে ও স্মৃতিকোঠায়।

শ্রীমায়ের কথাও ঠিক এরূপই। তিনি একান্তই মা যখন আমরা তাঁর সমীপস্থ হই মানবীয় ভাব নিয়ে।[১] মধুময়ী ও জগন্মোহিনী মানবী এই মা-ই আবার অনন্ত প্রেম, পার্থিব প্রজ্ঞার প্রতিমূর্ত্তি হয়ে তিনি আবার শাশ্বত আলো; তবুও এই মানুষীভাবে দেখার মধ্যেও, এই বিস্ময়মাখা শিশুসুলভ আদর, বিস্ময় ও ভক্তি শ্রদ্ধা নিয়ে দেখার মধ্যেও এক নিবিড়

১। ১৯৩৮ সালে কোন এক প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন—"ভগবান পরিধান করেন মানুষের সাজ, ধারণ করেন মানবীয় প্রকৃতি শুধু মানবীয় পথে বিচরণ করার জন্যে ও মানবকে দেখাবার জন্যে, কিন্তু তবুও তিনি তাঁর "ঈশ্বরত্ব" থেকে বিচ্ছিন্ন হন না। এ ঘটে শুধু ক্রমপ্রকাশের জন্যে। প্রকাশোন্মুখ দিব্য চেতনার ক্রমস্ফুটনের জন্যে, এ শুধু ভগবানের দিকে মানুষের ফিরে দাঁড়ান নয়। শ্রীমা বাল্যকাল থেকেই আন্তর চেতনায় সব সময়েই মানুষীভাবের অনেক উপরে।" (শ্রীঅরবিন্দের পত্রাবলী—পৃঃ ৪)

শান্তি ও পবিত্রতা। "আন্তর জীবনের" একটা মোটামুটি প্রাথমিক সূচীরেখা বা খসড়া—কয়েকটা দ্রুত অঙ্কিত অথচ অর্থপূর্ণ রেখাচিত্র যা সেই জটিল জগতের গুটিকতক বিক্ষিপ্ত সাঙ্কেতিক স্তম্ভ ও বাতিঘরকে সংযুক্ত করে—এইটুকুই এঁকে ধরতে চেষ্টা করা যায়।

দুই

"আমার জীবন উপরে দেখতে খুবই সাধারণ ও যতটা সম্ভব আটপৌরে : কিন্তু ভিতরে তার রূপ কি ?"[২]

"এই সত্তার সমস্ত পার্থিব জীবন, শুরু থেকে এই মুহূর্ত পর্য্যন্ত, এর কাছে মনে হয় একটি মিথ্যা স্বপ্নের মত।"[৩]

"আমি হলাম পৃথিবীতে একটি প্রকৃত শূন্য।[৪]

প্রায় ৩৫ বছর পূর্ব্বে লিখিত শ্রীমায়ের এই বাণীগুলি খুবই অর্থপূর্ণ। সাধারণ ও সামান্য ? মিথ্যা স্বপ্ন ? প্রকৃত শূন্য ? বাহ্য ও সত্য সত্তা? অন্ধ মানুষ কেমন করে বুঝবে দুয়ের মধ্যে পার্থক্য ? শ্রীমায়ের এই "সাধারণ ও সামান্য" জীবন হয়তো বাহ্যপ্রকাশ মাত্র ; কিন্তু অন্তরে অগ্নিশিখা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড, আলোর আগ্নেয়াস্ত্রের সক্রিয় বর্ম্ম—এ সবের প্রচণ্ডতা কেই বা অনুমান করেছে, এই আরোহণ যজ্ঞের আবক্ররেখা আর কেই বা চিহ্নিত করেছে ?

২। Prayers & Meditations-P/251

৩। Prayers & Meditations-P/231

৪। Prayers & Meditations-P/35

আজকের এই যে শ্রীমা—যিনি ফরাসীদেশের একজন ব্যাঙ্ক-অধ্যক্ষের কন্যা—তিনিও একদিন ছিলেন শিশু, কালে কৈশোরে পদার্পণ করলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে পেলেন শাশ্বত প্রকৃতির শক্তি ও মাধুর্য্য। শিশু, কিশোরী এ কথাগুলি কত দুর্ব্বোধ্য তা একটি কবিতার কয়টী ছত্র থেকে বোঝা যায়:

"তুমি যার বাহ্যমূর্ত্তি বুঝতে দেয়না
 পিছনে আত্মার ভূমাত্ব,
শ্রেষ্ঠ দার্শনিক তুমি, তবুও যে রাখো তোমার
 সনাতন প্রকৃতি, তুমি হলে দৃষ্টি স্বয়ং অন্ধদের জন্যে
রুদ্ধ তোমার শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বার ও নীরব তুমি, শাশ্বতের
 গভীরতম অর্থ তুমি খুলে ধর,
শাশ্বত মন তোমাকে অনুসরণ করে ছায়ার মতো,—
 সর্বসমর্থ নবি, কল্যাণী দ্রষ্টা।"

বালক কৃষ্ণ বালকোচিত ভাবে খানিকটা মাটি তুলে নিল মুখের মধ্যে। জননী যশোদা যখন সে-মুখ খুলতে বললেন তখন তিনি দেখলেন আশ্চর্য্যের চেয়ে আশ্চর্য্য—সারা বিশ্ব, ভূলোক, দ্যুলোক, গ্রহনক্ষত্র, চন্দ্রসূর্য্য সীমাহীন জীবজগৎ সবই ওই "কাণ্ডজ্ঞানহীন" শিশুর মুখের ভিতর। শিশুটির বিশালত্ব একান্ত সত্য; যতই আমরা চেষ্টা করি ছোটর পরিচয়ে তাকে আবদ্ধ, আচ্ছন্ন, আনত রাখতে তা সত্ত্বেও।

তের বৎসর বয়সে শ্রীমা এক অভিনব রূপান্তরের অভিজ্ঞতা পেয়েছিলেন আর রহস্যটি সেই থেকে প্রায় একটি

বছর ধরে জীবনে রোজ প্রত্যক্ষ করছিলেন অলৌকিক সূচনা :

"......প্রতিদিন রাত্রে আমি নিদ্রিত হওয়া মাত্রই আমার মনে হ'ত যেন আমি শরীরের বাহিরে এসে সোজা উপরে উঠে চলেছি—বাড়ি ছাড়িয়ে সহর অতিক্রম করে—বহু উর্দ্ধে। দেখতাম যেন আমি আমার চেয়ে দীর্ঘতর একটি অপূর্ব্বসুন্দর সোনার পোষাক পরেছি। যতই আমি উর্দ্ধে উঠতাম, এই পোষাকটিও ততই দীর্ঘ হ'তে থাকত এবং আমার চারিদিকে বৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়ত– সহরটির উপর একটি বৃহৎ আচ্ছাদন রচনা করে। তারপর আমি দেখতাম চারিদিক থেকে লোকেরা আসছে—আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা, অসুস্থ ও অসুখী। তারপর সেই প্রসারিত পরিচ্ছদটির নীচে সমবেত হ'ত, তাদের দুঃখ দুর্দ্দশা ও বেদনার কথা বলে, সাহায্য ভিক্ষা করে। প্রত্যুত্তরে সেই নমনীয় ও জীবন্ত পোষাকটি দীর্ঘ হয়ে তাদের প্রত্যেকের দিকেই যেত এবং তাদের স্পর্শ করা মাত্রই তারা পেত সান্ত্বনা, হয়ে উঠত সুস্থ, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুখী ও সবল হ'য়ে তাদের শরীরের মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করত।

আমার কাছে এর চেয়ে বেশী সুন্দর, এর চেয়ে অধিক আনন্দের আর কিছুই ছিল না। রাত্রের এই কর্ম্মটি—যা ছিল আমার যথার্থ জীবনস্বরূপ—এর কাছে দিনের সকল কর্ম্মই মনে হ'ত নীরস, নির্গুণ ও নিষ্প্রাণ। এই উর্দ্ধে উঠে চলবার সময় প্রায়ই আমার বামপার্শ্বে একজন নীরব, নিশ্চিচল বৃদ্ধকে

দেখতে পেতাম—তিনি তাঁর শুভেচ্ছা ও স্নেহ দিয়ে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করতেন; তাঁর উপস্থিতিই আমাকে উৎসাহ দিত। গায়ে বেগুনী রংয়ের দীর্ঘ পোষাক পরিহিত এই বৃদ্ধটি 'ছিলেন; তিনি হলেন—অনেক পরে আমি জেনেছি যাঁকে লোকেরা বলে দুঃখের মানুষী বিগ্রহ।"[৫]

এ এক অপূর্ব্ব সতর্ক জাগরণ। সত্যই শিশুটি হ'ল কল্যাণীদ্রষ্টা, সর্ব্বসন্তাপহারিণী। এমন কি দুঃখের হিমালয়ও একান্ত নিষ্পিষ্ট করতে পারেনা; তাঁর সেই বিশুদ্ধ প্রসারিত পরিচ্ছদটির আছে এক আন্তরগতি এবং এই গতির সাথে সাথে শুরু হয় নিরাময় কার্য্য ও দূরীভূত হয় সব ব্যথা।[৬]

তিন

শিশু যেমন সন্তানের পিতা, তেমনি আবার নারীরও মাতা। কবি বলেছেন :

ওই দেখি সে-নারীরে, যার চোখে চোখ
মিলাইতে চায় আঁখি অথচ জানেনা
কোথায় সে, কার পানে করে আরোহণ
পৃথিবীর পত্র-যাত্রা; না জানিয়া তবু

৫। Prayers & Meditations-P—61-62

৬। ঋষভচাঁদ লিখেছেন তাঁর "In The Mother'sLight" (শ্রীমার আলোর পরিপ্রেক্ষিতে) পৃঃ ৬, ১ম ভাগ পুস্তকে : "এই সোনার পরিচ্ছদটির প্রসারণ হল ভাগবতী করুণার এক অর্থপূর্ণ ভঙ্গি—যেন নেমে আসছে আর্ত্ত-তাপিত মানুষের উদ্ধারের জন্য।"

তারি তরে ছন্দ করে পক্ষ সঞ্চালন ;
চন্দ্র-সূর্য্যে গাঁথা তাঁর অসীম ললাট
তারা-ফুল অঙ্কে নিয়ে দ্বন্দ্ব-তট হতে
শান্ত ক'রে ডেকে আনে সুরের আলোকে
নিহারিকার সংগীত ; সে বিবিধ-স্বর
তাঁর দৃষ্টিমাঝে পায় মৈত্রীর অমৃত,
তাঁর প্রসন্ন দর্শনে ছন্দিত শুভ্রতা।[৭]

যে তের বছরের শিশু অপূর্ব্ব অসাধারণ সব স্বপ্ন দেখত, আর জগতের বেদনার ভার অন্তরে অনুভব করত এবং সে বেদনা নির্ম্মূল হ'য়ে যেত তার নিরাময়কর স্পর্শমাত্রেই, যে শিশু ধীরে ধীরে সেই নীরব অচল দুঃখের মানুষী বিগ্রহের সঙ্গে মিশে যেত, সে শিশু তারপর হলেন একজন "সম্ভ্রান্ত মহিলা"। কিন্তু সেই "সম্ভ্রান্ত মহিলা" বিস্মৃত হন নি তাঁর অতীতের সুস্পষ্ট সব অলৌকিক দর্শন, ভগবানের স্বপ্ন-প্রত্যাদেশ।

অধ্যাত্মের পথে অন্বেষু কয়েকজনের একটি ছোট দল একসঙ্গে সভায় বসত কারণ তারা অদৃশ্য পরমের ভাবনায় ভাবিত; তারা তাদের গভীরতম ভাব ও চিন্তাধারার আদান প্রদান করত, দর্শনশাস্ত্র নীতিশাস্ত্রের কণ্টকিত সমস্যার আলোচনা করত, আর উদ্দেশ্যমূলক কর্ম্মশক্তির উৎসের গবেষণা করত। "সম্ভ্রান্ত মহিলা"ই হলেন এই দলটির প্রাণ ও আত্মা, তিনিই এনে দিতেন অনুসন্ধিৎসুদের মধ্যে স্থূল ঐক্য এবং পথের নির্দ্দেশ। ১৯০৭ সালে একদিন রাশিয়া থেকে

একজন আগন্তুক প্যারিসে এই দলটিকে খুঁজে বার করে বলল,—"হ্যাঁ, কিয়েভ সহরে আমাদের একটি বিদ্যার্থীমণ্ডল আছে, যারা এই দার্শনিক চিন্তাধারায় গভীর অনুরাগী। তোমাদের কতকগুলি বই আমাদের হাতে পড়েছে ও অবশেষে তোমাদের সার্ব্বভৌম শিক্ষা দেখে আমরা অত্যন্ত প্রীত হয়েছি এই ভেবে যে আমাদের শিক্ষা নিছক মতবাদের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ নয়, তার পরিণতি কর্ম্মে। তারপর আমার সহকর্ম্মীরা বলল আমায় "যাও, ওদের পরামর্শ নিয়ে এস সেই আলোচ্য বিষয়টির যার অনুরাগী আমরা এবং সেইজন্যই আমি এসেছি।"[৮] তারপর আবার সুবিবেচনার সঙ্গে বলল, "আমার কাজ রাষ্ট্রবিপ্লবের।"[৯]

রাষ্ট্রবিপ্লবী কোনঠাসা—এমন একটা দিন আসেই যখন পৃথিবীর সব ব্যাজারভ্‌রাই কোনঠাসা হয়—এবং রাষ্ট্রবিপ্লবীর মনে এই সন্দেহ জাগে যে তার দর্শন ও কর্ম্মের একেবারে কেন্দ্রে কোথাও অন্ধকার ও নিস্ফলতা আছে কিনা। হিংসার পথ, প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার কৌশল—তারা নিয়ে যায় চোরাগলিতে। বেপরোয়া প্রচণ্ড আঘাতে হয়ত আছে এক নির্ভীক মহত্ত্বের রোশনাই, কিন্তু চরম বিশ্লেষণে দেখা যায় তা নির্ব্বোধ, নিরর্থক। "অবিচারের সাহায্যে কি করে আশা করতে পার ন্যায় বিচার, কি করে আশা করতে

৭। Francis Thompson

৮। Words of Long Ago P-8 (1955)

৯। Words of Long Ago P-8

পার বিদ্বেষের মাধ্যমে মৈত্রী?"[১০] আগন্তুক উত্তর দিলেন—"তা জানি···ঘটনাচক্র যখন মানুষকে ঠেলে নিয়ে যায় তখন তার করণীয় কি?···এমন কি প্রয়োজন হ'লে আমরা শেষ ব্যক্তিটি পর্য্যন্ত প্রাণ দেব তাও স্বীকার তবুও আমাদের পবিত্র কর্ত্তব্য থেকে বিচ্যুত হবনা, যে পবিত্র মন্ত্রের সাধন শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত করব বলে নিজেদের কাছে প্রতিশ্রুত, তার অবমাননা আমরা করব না।"[১১] সেই আগন্তুকের মুখমণ্ডলে এক মহান অলৌকিক প্রভা ফুটে উঠল এবং তার নৈরাশ্যের মধ্যেও ছিল সৌন্দর্য্য ও উদ্দীপনা। কিন্তু মরণ, সে ত যথেষ্ট নয়; বেঁচে থেকে সব জয় করাই ত সুপথ। সম্ভ্রান্ত মহিলার যে উপদেশটি এ প্রসঙ্গে মাতৃসুলভ ও জ্ঞানদীপ্ত, তা হ'ল:

"কিছুকালের জন্য এসব বিরতি দিয়ে অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থেকে নীরবে নিজেদের প্রস্তুত করে নিতে হবে, নিজেদের শক্তি সব সংহত করে নিতে হবে, দলে দলে সুগঠিত হ'তে হবে, একটা ক্রমবর্দ্ধমান ঐক্য আনতে হবে ;যার ফলে ভবিষ্যতে কোন মুহূর্ত্তে আপনারা গঠনক্ষম বুদ্ধিকে ধরে এমন এক সর্ব্বজয়ী অস্ত্র হাতে নিয়ে দাঁড়াবেন যা কিছুতেই কখনো হিংসাবৃত্তির মত ব্যর্থকাম হবে না। শত্রুর হাতে অস্ত্র তুলে দেবেন না বরং তাদের সামনে নিষ্কলঙ্ক হ'য়ে দাঁড়ান, তাদের দেখতে দিন ভীতিহীন ধৈর্য্য, সততা ও ন্যায়ের দৃষ্টান্ত। তখন

১০। Words of Long Ago P-11

১১। Words of Long Ago P-11

নিকটতর হবে আপনাদের জয়। কেন না সে ক্ষেত্রে আপনাদের থাকবে ন্যায়, পরিপূর্ণ ন্যায়—আদর্শে ও উপায়ে উভয়তঃ।"[১২]

আগন্তুকটি অভিভূত, "তাঁর সকরুণ বিষণ্ণ চোখ দু'টি আমাদের পানে ফেরালেন, সে চোখে আত্মপ্রত্যয় আর আশা সুপ্রতিষ্ঠিত" এবং তার বিদায়বাণী হ'ল—"বড় আনন্দের কথা আজ এমন সব মানুষের সাক্ষাৎ পেলাম যাঁদের কাছে মনের কথা ব্যক্ত করা যায়, যাঁদের ন্যায়ের আদর্শ আমাদেরই মতন, যাঁরা আমাদের দুষ্কৃতকর্ম্মী কিম্বা উন্মাদ মনে করেন না যেহেতু আমরা সেই আদর্শকে ফলিয়ে তুলতে চাই। আচ্ছা তা হলে আসি, আবার শীঘ্রই দেখা হবে।"[১৩]

এই হল সেই "সুহৃদয় ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি"র প্রসঙ্গের শেষ, যিনি ছিলেন অধ্যাত্মপন্থী, এমন কি মনে হয় শহীদ। তিনি এসেছিলেন শ্রীমার কাছে তাঁর নিদারুণ যাতনা, বিহ্বলতা নিয়ে, আদর্শ অনুরাগ ও নৈরাশ্য নিয়ে, কিন্তু শ্রীমার নিরাময়ক স্পর্শ তাঁকে শান্ত ও আরোগ্য করল, আত্মার ক্ষত সব বুজিয়ে দিল, সঙ্কটমুহূর্ত্তে তাঁকে রক্ষা করল।

চার

শ্রীমা হলেন একটি অধ্যাত্মজীবন-অনুসন্ধিৎসু মণ্ডলীর প্রাণ। সে মণ্ডলীর কেন্দ্রটি ছিল প্যারিসে, কিন্তু তার

১২। Words of Long Ago P-12
১৩। Words of Long Ago P-15

প্রভাবের পরিধি ক্রমেই দূরে দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ছিল। সেখানে হ'ত আলোচনা, আলাপ ও কর্ম্মপন্থা নির্ব্বাচন। অভিজ্ঞতা যুক্তির সাথে মিশল, তর্ক-বিচারের সাথে মিলল দৃষ্টি, হৃদয় মনের সঙ্গে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হ'ল এবং এভাবে জিজ্ঞাসুরা হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে চলল জীবনের পূর্ণ আদর্শের দিকে, তাকে পাওয়ার এক সর্ব্বাঙ্গীণ উপায় ধরে। শ্রীমার উপ-দেশাত্মক উপকথা অনুপ্রাণিত মুখ থেকে উৎসারিত হ'ত, আর শ্রোতাদের অন্তরে তা অমৃতধারারূপে প্রবেশ করত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি যুবক ছাত্রের গল্প[১৪] আছে—এক "অব্‌লোমভ্‌" বলতে পারো তাকে—যে দীর্ঘসূত্রিতায় অভ্যস্ত:—

কাল, আগামী কাল, আর আগামী কাল,
এই ক্ষুদ্র পদক্ষেপ মন্থর গতিতে চলে
পরিচিত কালের শেষ সীমান্ত পর্য্যন্ত···

যুবক শেষে ঘুমিয়ে পড়ে, স্বপ্ন দেখে এক বিমোহন পথ ও চমৎকার রাস্তায় এক মনোরম ভ্রমণ। "সূর্য্য তখন তেমনি উজ্জ্বল, গাছে গাছে বিহঙ্গের গান; অপূর্ব্ব দিনের সব পূর্ব্ব-লক্ষণ।"[১৫] যুবক চলে আরও দূরে, নিদারুণ নিরুদ্বিগ্নতার তরঙ্গ-শিখরের উপর দিয়ে, কিন্তু অন্তরে কোথায় যেন জ্বালা দেয় এক অস্বস্তি, আর মনে মনে ভাবে, "আমি কোথায়? চলেছি কোথায়? কিই বা এসে যায় তাতে? ভাবনা কেন,

১৪। শ্রীমার বয়স যখন ১২ বৎসর সেই সময় লিখিত।

১৫। Words of Long Ago P-1

কিছু করবার চেষ্টাই বা কেন ? এস, এই অন্তহীন পথে গা ঢেলে দিয়ে আমরা ভেসে যাই; হেঁটে চলি তো এখন, ভাবনা করবো আগামী কাল।"[১৬] সে প্রলোভিত হ'ল সংজ্ঞাহীন-ভাবে একটি গভীর গিরিপথের দিকে, তা ক্রমশঃ নিবিড় হতে নিবিড়তর হ'য়ে উঠল, দেখল আবছা বিবর্ণ মানুষের মূর্ত্তি, দুরবস্থায় কর্দ্দমাক্ত, দেখল পেঁচক, কাক, বাদুড়ের দল যেন কি বলে গেল কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে, যুবকটির মনে হ'ল বাস্তবিকই যেন সে যমরাজের প্রেতরাজত্বে পথভ্রান্ত হয়ে গেছে। যেন অপরিহার্য্যভাবে দুর্ভাগ্যের দিকে পতিত হতে লাগল। রাত্রের বীভৎস দুঃস্বপ্ন শেষ হ'ল তার। সে উঠে পড়ে চলতে শুরু করল, ঘুমন্ত চোখ বিস্ফারিত করে ঘোষণা করে উঠল, "আরে, সব তো অতি সরল, সহজ; পথটি 'পরে করব'র পথ, আর রাস্তাটি 'কালকে'র রাস্তা…।"[১৭] আর সেই সমুজ্জল স্বপ্ন-পুরীটি—তা হ'ল "কিছুনা"র প্রাসাদ। ছাত্রটি এইভাবেই একান্তই ব্যাধিমুক্ত হ'ল।

শ্রীমার লিখিত আর একটি উপকথা আছে। মেঘলোকে অবস্থিত এক 'সত্যের প্রাসাদ'—এই প্রাসাদের বহিঃকক্ষ হ'ল 'বুদ্ধির কক্ষ', আর সেখানে চলছিল বিরাট ভোজের উৎসব। সদ্‌গুণেরা সব একে একে উপস্থিত হ'তে লাগল, অবিলম্বে তারা দলে দলে ভাগ হয়ে দাঁড়াল "যার যেখানে আকর্ষণ সেইভাবে। সকলেই খুব খুসী—সাধারণতঃ এ-জগতে সে-

১৬। Words of Long Ago P-2

১৭। Words of Long Ago P-5

জগতে নানা-জগতে তারা সব পরস্পর ছড়াছড়ি হয়ে আছে, যত রাজ্যের বিদেশীদের মধ্যে পৃথক হয়ে আছে—অন্ততঃ একবার তারা সবাই এক সাথে মিলিত হ'ল।"[১৮]

সভাপতি ছিল 'আন্তরিকতা', তার পরিধানে ছিল স্বচ্ছবসন ও হাতে ছিল বিশুদ্ধ ঘনাকার স্ফটিকখণ্ড, যার ভিতর দিয়ে বিনা-বিকৃতিতে সব জিনিসই প্রতিফলিত হয়। তার বিশ্বস্ত সহচর হ'ল 'বিনতি' ও 'সাহস'। আর 'সাহসের' সন্নিকটে দাঁড়িয়ে এক মহিলা সম্পূর্ণ অবগুণ্ঠিতা—সে হ'ল 'সাবধানিকা'।

মহাশয়া 'উদারতা'—"যুগপৎ শান্ত ও সতর্ক, কর্ম্মরত অথচ সংযত"—একেবারে মধ্যস্থলে অবস্থিত অর্থাৎ সর্ব্বদাই সকলের নিকটস্থ, আর তার অভিন্ন সহচরী হ'ল তারই ভগিনী 'ন্যায়পরতা', কিন্তু 'উদারতা' যখন বুদ্ধির কক্ষের মধ্য দিয়ে তার অলক্ষ্যে চলাফেরা করে তখন রেখে যায় তার চলার পথে "শুভ্র মৃদুল আলোর ধারা" যা বিচ্ছুরিত হয় চতুর্দ্দিকে। আবার উদারতাকে চতুর্দ্দিকে ঘিরে অথচ অন্তরালে রয়েছে 'দয়া', 'ধৈর্য্য' ও 'নম্রতা'।

সদ্‌গুণেরা সবাই মিলেছে একত্রে—কিন্তু দরজার চৌকাঠের বাইরে কে যেন দাঁড়িয়ে, সকলেরই কাছে সে একেবারে অপরিচিতা আগন্তুক—"অতি নবীন ও কোমলকান্ত দেহ, অতি সাধারণ, প্রায় গরীবেরই মতন।"[১৯] 'সাবধানিকা'

১৮। Words of Long Ago P-16

১৯। Words of Long Ago P-18

এগিয়ে গেল অপরিচিতা নবাগতার কাছে, বিনীত স্বরে জিজ্ঞাসা করল তার নাম। নবাগতা একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দিলে "হায়, এখানে আমাকে যে বিদেশিনী বলে মনে হয় তাতে আমি বিস্মিত নই। আমি খুব কম জায়গাতেই নিমন্ত্রিত হই। আমার নাম 'কৃতজ্ঞতা'।[২০]

পাঁচ

শ্রীমার লেখার মধ্যে কতকগুলি প্রবন্ধও আছে যাদের আলোচ্য বিষয় হ'ল—চিন্তা, স্বপ্ন, দুঃখ-বেদনার দান, ঈশ্বরের আত্ম-পরিচয় ইত্যাদি। এগুলি শুধু চাতুর্যপূর্ণ প্রবন্ধ নয়। অকপট মনীষাদীপ্ত আলোকোজ্জ্বল এ রচনাবলি; এগুলি যুগপৎ আস্পৃহার লতা ও অনুভূতির প্রথম মুকুল। উপকথারই মত এ প্রবন্ধগুলিও অধ্যাত্ম-অন্বেষুদের উদ্দেশ্য করে লিখিত।

"চিন্তা…এ তো এক বিশাল বিষয়।" লক্ষ্যহীন, স্বেচ্ছাচারী, বিশৃঙ্খল চিন্তাগুলি তাদের আসল উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে, লক্ষ্যকে সত্যভ্রষ্ট করে, চিন্তার অসংখ্য ধারাকে বিকৃত করে। আমরা যদি চিন্তাগুলিকে বিশৃঙ্খলভাবে দাঙ্গা শুরু করতে ছেড়ে দিই তাহ'লে এক বীভৎস বিপরীত সম্ভাবনার আক্রমণের সামনে ধরা পড়ব এবং পরে আপন-সৃষ্ট এক বিরাট কোলাহলের মধ্যে বাস করব। সেইজন্ত প্রথম প্রয়োজনীয় হ'ল "প্রশান্তি"। "আমাদের মস্তিষ্ককে

২০। Words of Long Ago P-18

বিশৃঙ্খল ও এলোমেলো মানসিক চাঞ্চল্য থেকে মুক্ত করতে হবে।"[২১] "আমাদের চিন্তাকে সত্যাকারে ও একান্তভাবে নিজের করে নিতে হ'লে তাকে চলিতরুচির ঘূর্ণিহাওয়ার প্রতিধ্বনি হলেই চলবে না, হতে হবে সেই সুসঙ্গত সমন্বয়ের অঙ্গ যাকে সমস্ত জীবন ধরে পর্যবেক্ষণ অভিজ্ঞতা ও সারসিদ্ধান্ত কিম্বা গভীর ধ্যান বা চিন্তা দিয়ে তুমি গড়ে তুলেছ।"[২২]

স্থিরতা, ধ্যান—এ দুইই দুঃসাধ্য জিনিস। সেজন্য ভারতীয় তত্ত্বশাস্ত্রে রূপকথার গল্প হিসাবে ধ্যানের বর্ণনা করা হয়েছে।[২৩] চিন্তাকে স্থিরতার সলিলে যখন পবিত্র করা যায় আর ধ্যানের কূটে শাস্ত করা হয়, তখন এক নূতন দীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে, পরম শক্তি অর্জন করে, আত্ম-বিভাজন ও বন্ধ্যাত্ব পরিহার করে এবং হয়ে উঠে অখণ্ড সত্যের প্রবাহ—এক স্বপ্রতিষ্ঠ বিশ্বজনীন সত্য। তারপর কুয়াসা বিদূরিত হয়, আর মনের মালভূমিতে নেমে আসে আলোর বন্যা: সেণ্ট টেরেসা যেমন বলেছিলেন "যখন সূর্যের রশ্মি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে তখন মাকড়সার জাল একটিও নজর এড়ায় না।"[২৪]

২১। Words of Long Ago—P.21

২২। Words of Long Ago—P.23

২৩। Words of Long Ago—Pp.26-28

২৪। Life of St Teresa (Written by herself)—Translated by D.Lewis – Chap. XIX

হ্যামলেট বলেছিলেন, "নিদ্রা, বোধ হয় স্বপ্নের লোভে, হ্যাঁ, ওইখানেই তো মুসকিলের মূল।" স্বপ্ন কি তবে শুধুই মানসিক চঞ্চলতা, অজীর্ণের চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়? স্বপ্ন কি শুধু মিথ্যা, বৃথা আশা ও বাস্তব রসিকতা ছাড়া আর কিছু নয়? স্যামুয়েল দানিয়েলের কাছে স্বপ্নের কোন প্রয়োজনই ছিল না, তাই তিনি বললেন :

"থামাও স্বপ্ন, বাসনার যত প্রতিমূর্তি তার সব
যদি চাও সুস্থ রূপ দিতে আগামী কালের কামনা-বাসনার :
নবোদিত সূর্যকে কখনই দিও না মিথ্যা এদের সমর্থন করতে,
এরা আমার দুঃখকে বাড়িয়ে তীব্র করে তোলে।"

তা হ'লে শ্রীমার তের বৎসর বয়সের স্বপ্ন সম্বন্ধে কি বলা যায়? সেগুলি কি স্বপ্নাতীত—অন্ততঃপক্ষে সময়ে সময়ে—তা কি অলৌকিক ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার নির্দেশ?

বাস্তবিক এ সমস্যার সমাধান বিশেষ প্রয়োজন। স্বপ্ন কি তা'হলে শরীরেরই একটা অস্বাভাবিক উপবৃদ্ধি যাকে জীবন থেকে পরিহার করতে হবে কিম্বা এ কি বরং মানুষের এক অপরিণত ষষ্ঠ বোধ যাকে সযত্নে পোষণ ও পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে? প্রসঙ্গটি বিচারসাপেক্ষ এবং শ্রীমা তাঁর 'স্বপ্ন' শীর্ষক প্রবন্ধের সমাপ্তি টানেন এই বলে যে যদি সুষ্ঠুভাবে স্বপ্নকে নিয়ন্ত্রিত ও সমৃদ্ধ করা যায় তাহ'লে তা "এইভাবে সুস্পষ্ট সূক্ষ্মদর্শনের রূপ পরিগ্রহ করবে এবং কখনো কখনো তা হ'বে ভবিষ্যতের সাক্ষাৎদর্শন। ক্রমে গুরুত্বপূর্ণ সব

জিনিসের একটা প্রয়োজনীয় আদ্যন্ত ধারাবাহিক জ্ঞান আয়ত্তে এসে যাবে।"[২৫]

স্বভাবতই স্বপ্নাবেশে চেতনা থাকে নিম্নস্তরে। অপরদিকে স্বপ্ন-জগৎ তমসাচ্ছন্ন ও অপরিচিত জগৎকে নিয়ে, যা আমাদের চেতনাকে বিপরীতভাবে অভিভূত করে। যতই আমরা জাগ্রত চেতনাকে আয়ত্তাধীনে আনতে পারি ততই এই নিকৃষ্ট স্বপ্নবস্তু ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তারপর বিশুদ্ধ স্বপ্নের পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে, "আমাদের ও অপরের প্রকৃতির গুপ্ত রহস্যটি প্রকট হয়ে উঠবে।"[২৬] এই সকল স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন নয়; বরং "স্বপ্ন-সমাধি—স্বপ্নাবস্থায় আন্তর সত্তার এক সচেতন উপলব্ধি।"[২৭]

ছয়

"আমার অন্তর কষ্ট পেয়েছে, কাতরোক্তি করেছে, দারুণ দুঃখের ভারে প্রায় ভেঙ্গে পড়বার মত, দুঃসহ যন্ত্রণার তলায় তলিয়ে যাবার মত। কিন্তু আমি তোমাকে ডেকেছি: হে শান্তিদাতা ভগবান, সকল অন্তর দিয়ে প্রার্থনা করেছি, আর তখনি তোমার দীপ্যমান জ্যোতি দেখা দিয়েছে, নব জীবন দান করেছে আমাকে।"[২৮]

২৫। Words of Long Ago—P. 11

২৬। Sri Aurobindo's "Bases of Yoga"—P. 128 (1941).

২৭। Letters of Sri Aurobindo, 2nd series—P. 166

২৮। Words of Long Ago—P. 12

শ্রীমার এই বাণীর মধ্যে আমরা দেখতে পাই দুঃখের অমানিশা থেকে নব জ্যোতি ও জীবনের জ্যোতির্ম্ময় অমৃতময় ঊষায় আত্মার উত্তরণের একটা নমুনা-বিবৃতি। আধ্যাত্মিক ঘটনার এই যে অনুক্রম তা হল প্রকৃতির জড়তত্ত্বেরই মত বাস্তবতায় পূর্ণ, আমাদের সঙ্গে তার আবার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

আমরা দুঃখভোগ করি কেন? আমাদের দুঃখভোগ করতে হবেই বা কেন? এর কারণ কি প্রকৃতি অন্ধ বলেই অকারণে অনুদ্দেশ্যে আমাদের আঘাত দেন? প্রকৃতি কি তাহলে এক দুষ্টা দানবী যে চক্রান্ত করে আমাদের লক্ষ্যকে বিভ্রান্ত করেন? মানসিক বা দৈহিক বেদনা হল 'আদম'-এর বংশ-পরিচয় মাত্র। সুকৃতি ও পুরস্কার, দুষ্কৃতি ও দুঃখের মধ্যে অনিবার্য কোনো কার্য-কারণ সম্বন্ধ কি আমরা আবিষ্কার করতে পারি? এই বিভাগ কি অমোঘ, না এরা কতকগুলি অস্পষ্ট আপেক্ষিক শব্দমাত্র?

কেন তবে পাপীর পথ হ'য়ে চলে সমৃদ্ধ? কেন আমার সমস্ত প্রচেষ্টার সমাপ্তি হবেই নৈরাশ্যে?

> ভদ্রে, আপনার জন্য
> জীবনের আমি যত খরচ করি
> তার চেয়ে মুহূর্ত্তের অবকাশক্ষণে বেশি লাভ করে
> কামনার ক্রীতদাস...[২৯]

এ জগতে আমরা রসাল ফলের জন্যে ঘুরে বেড়াই বা ভারাক্রান্ত চোখে বসে থাকি আর পরস্পরের কাতরানি

২৯। Gerard Manley Hopkins

শুনি। এই যে রসময়-ফলের জীবন তার অভদ্রজনিত আঘাত ও বিবিধ যাতনা থেকে রেহাই পাবার কোন পথ নেই কি?

"দুঃখ আছেই"—আর এ ইউক্লিডীয় জগতের এমন অবাঞ্ছিত সংস্পর্শ থেকে নিস্তারের সহজ পথ নেই। দুঃখ অপ্রীতিকর, অবাঞ্ছিত, কিন্তু যখন আমরা পিছন ফিরে দূরে তাকিয়ে দেখি তখন দুঃখ ও পার্থিব জীবনের অন্যান্য উপাদানের মধ্যে একটা অখণ্ড সম্বন্ধের সূত্র খুঁজে পাই। একি হতে পারে যে যাকে আমরা দুঃখ বলি তা মানবের বহির্জীবনের বিকাশ ও আন্তর জীবনের ফুল ফুটানর দিকে একটা বিশেষ, এমন কি, একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসাধন করে? হপ্‌কিন্‌সের কথা

> যেমন সশব্দে লোহা পেটায় তেমনি
> আর আগুন দিয়ে তার মধ্যে তোমার ইচ্ছাকে গড়ে তোল,
> কিম্বা, না হয় কিম্বা, বসন্তের মত চুপি চুপি চুরি করে তার ভিতরে এসে
> তাকে গলিয়ে ফেল আর হও তার অধীশ্বর।

সেণ্ট জন্‌ অব্‌ দি ক্রস এসে বললেন—

> ওগো দাহন, তুমি যে দগ্ধ দিয়ে সব নিরাময় করো,
> ওগো সুখ-শিহরণের চেয়ে প্রিয় আঘাত,
> ওগো কমল-কলি হাত, ওগো কোমল পরশ,
> নূতন জীবনের সন্ধান দাও তো তুমিই,
> তোমার করুণার নাই তো সীমানা।

আর নিধনের শাস্তি দিয়ে মৃত্যুকে নিয়ে যাও জীবনে।[৩০]

অপরপক্ষে সন্ন্যাসীর নেতিবাদের সব অত্যুক্তি স্বীকার করাও অপ্রয়োজনীয়, এমন কি নির্বুদ্ধিতা ও বিপজ্জনক। শ্রীমা বলেন,"দুঃখভোগ করতেই হবে এমন বাধ্যবাধকতা কিছু নেই, আর তা বাঞ্ছনীয়ও নয়। তবে যখন আমাদের কাছে এসে পড়ে তখন তা কত সাহায্যই না করতে পারে।"[৩১] নির্বিচারে দুঃখকে প্রশ্রয় দেওয়া—দেহের বা মনের উপর অপর্যাপ্ত যাতনা প্রয়োগ করা—এ হ'ল ততটাই হাস্যকর ভাবালুতা যতটা অন্য কোন আবেগাচ্ছন্ন অবস্থার কাছে নিজেকে সমর্পণ করা। প্রয়োজন হল সাফল্য বা অসাফল্য আনন্দ বা দুঃখের সামনে আত্মপ্রশ্রয়ের চেয়ে আত্ম-প্রভুত্ব এবং এইভাবে হৃদয়ের গভীর অনুভূতিগুলিকে "স্থিরতা, সংযম, শুদ্ধিকর সংযম দমনের"[৩২] দ্বারা রূপায়িত করতে হবে।

বেশ, তাহ'লে যখন দুঃখ বেদনাকে স্বাগত করবার প্রয়োজন নেই, তখন তাকে ভয় করাও নিষ্প্রয়োজন। যদি সে আসে, আসবে সুদূর ভবিষ্যতের কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এবং বর্তমানের সংক্ষুব্ধ উত্তেজনার মধ্য থেকে মন্থন করে তাকে আবিষ্কার করাই আমাদের কাজ; আমরা তাই আমাদের বিশ্বাসে সন্দিহান হব না বা আত্ম-আবিষ্কারের অক্লান্ত পরিশ্রম থেকেও বিরত হব না:

৩০। Arthur Symons

৩১। Words of Long Ago—P. 42

৩২। Letters of Sri Aurobindo—P. 213

"তোমরা যারা অশ্রুপাত করছ, যারা কষ্ট পাচ্ছ, যারা ভয়ার্ত, জান না কতদিন চলবে তোমাদের এই দুর্দৈব, এ দুঃখের কি ফল, তাকিয়ে দেখ: এমন রাত্রি নেই যার শেষে প্রভাত আসে না, অন্ধকার যখন ঘনীভূত হয় তখনই প্রভাত আসন্ন; এমন কুয়াসা নেই সূর্যালোক যাকে সরাতে পারে না, এমন মেঘ নেই যাকে সে উজ্জ্বল করে তোলে না; এমন অশ্রু নেই যাকে একদিন সে শুকিয়ে ফেলতে পারে না, এমন ঝড় নেই যার শেষে এঁকে ধরে না তার বিজয়ের ইন্দ্রধনু, এমন তুষার নেই যাকে সে গলিয়ে ফেলে না, এমন শীত নেই যাকে সে রঙীন বসন্তে পরিণত না করে।

"তোমাদের ক্ষেত্রেও তেমনি, নেই এমন দুঃখ যন্ত্রণা যা প্রতিদানে নিয়ে আসে না ঐশ্বর্যের ভারা, নেই এমন বেদনা যা রূপান্তরিত না হয় আনন্দে, নেই এমন পরাজয় যা শেষে দাঁড়ায় না বিজয়ে, এমন পতন যা হয়ে উঠে না আরো উর্ধ্বারোহণ, এমন নিঃসঙ্গতা যা কখনো হয়ে উঠে না জীবনের নীড়, এমন বিশৃঙ্খলা যা হয়ে উঠে না সুসঙ্গতি।"৩৩

এর পর আরও আছে: শ্রীমা আমাদের আশ্বাস দেন যে দুঃখের শেষ প্রান্ত হ'ল আত্মোন্মীলনের গৌরচন্দ্রিকা যা আমাদের সত্যের দরজায় নিয়ে যায়:

"প্রতিবার যখন বোধ হয় হৃদয় বুঝি বিদীর্ণ হয়ে গেল, নিজের ভিতরে আরো গভীরে তখন একটা দরজা খুলে যায় আর উন্মুক্ত হয় নবতর দিগন্ত-রেখা—প্রতিবার নিয়ে আসে

৩৩। Words of Long Ago —P. 49

অধিকতর প্রচ্ছন্ন ঐশ্বর্য—তারা আসে মুমূর্ষু জীবের মধ্যে আবার এক নবীন প্রখর প্রাণধারা ঢেলে দিতে।

"হে ভগবান, আর এই পুনঃপুনঃ অবতরণের মধ্যে দিয়ে চলে এসে, শেষে যবনিকা যখন অপসৃত হয় তখন তোমাকে দেখি সাক্ষাৎ,—কে প্রকাশ করবে সে-মহাপ্রাণের প্রখরতা যাতে সমস্ত সত্তা অনুপ্রবিষ্ট, সেই জ্যোতি যাতে সে পরিপ্লাবিত, সেই প্রেমের মহিমা যাতে সে চিরতরে রূপান্তরিত।"[৩৪]

"আঘাত' আমাদের জীবনে প্রায়শ এমনই প্রয়োজনীয় উপাদান—সংঘর্ষ আমাদের অকস্মাৎ সজাগ করে দেয়, আমাদের চক্ষু উন্মীলিত করে দেয়, দেহের ও মনের তামসিকতার জমাট আসর ভেঙ্গে দেয়, নব নব আবিষ্কার উদ্ভাবনার পথে নিয়ে যায়। রাজকুমার সিদ্ধার্থ অনেক আঘাতের পরে বের হয়েছিলেন বহুদূরের পথ ধরে বোধি-গাছটির তলে নীরব গোপন পীঠস্থানের উদ্দেশে। সাধারণত আমরা অনাধ্যাত্মিক আচ্ছন্নতার মধ্যে আকণ্ঠ মগ্ন হয়ে বাস ও চলাফেরা করি তা আমাদের আসল সত্তাকে চিনতে দেয় না, ভিতরের ও বাহিরের ঐশ্বর্যকে ধরতে দেয় না, ব্যক্তিগত নিয়তিকে দেখতে চিনতে দেয় না। অকস্মাৎ দুঃখের আঘাত কখন কখন সম্পূর্ণ মোড় ঘুরিয়ে দেয়—দেহে যখন এসে ধাক্কা লাগে চক্ষু তখন বিস্ময়ে পায় নবোন্মেষ—খোলসটি যেন গা থেকে খসে পড়ে—অবশেষে শুরু হয় পুনর্জন্মের। শ্রীমার

৩৪। Words of Long Ago—P. 42

অভয়বাণী কাব্যের উদ্দীপনা ও ওজস্বিতা নিয়ে প্রমূর্ত হয় আমাদের সামনে—

"আরো শোন : যে মুহূর্তে এই পৃথিবীর উপর মানুষ তার ভাগবত উৎস থেকে বিযুক্ত হয়েছে তখনকার মত সঙ্কটাপন্ন অবস্থা আর কখনো হতে পারে না। মাথার উপর তার তস্কর শত্রুর রাজ্য সীমানা, দিগন্তের দুয়ারে আগুনের তরবারি হাতে কারা-প্রহরী। তাই তো উর্ধ্বে জীবনের উৎসে সে যখন উঠে যেতে পারল না, সে-উৎস তখন তার মধ্যেই উৎসারিত হল; উপর থেকে আলো গ্রহণ করতে পারল না, তাই তার সত্তার অন্তঃস্থলে ফুটে উঠলো সে আলো; বিশ্বাতীত প্রেমের সাথে যোগসাধন করতে পারল না, তাই সে প্রেম নিজেকে পূর্ণাহুতি দিল, করল আত্মদান, তার আবাস তার মন্দিররূপে বরণ করে নিল প্রত্যেকটি পার্থিব জীবকে।

"এই রকমে এই অবহেলিত অথচ উর্বর, পরিত্যক্ত অথচ পুণ্যবান জড়ের প্রতিটি পরমাণুতে রয়েছে এক ভাগবত চৈতন্য, প্রত্যেক জীব তার অন্তরে নিয়ে চলেছে ভগবানকে, তাই যেমন মানুষের মত দুর্বল আর কেউ নেই, তাই আবার তার মত স্বর্গীয়ও কিছু নেই।

এক যা সত্য, অতি সত্য, দীনতা হীনতার অন্তরেই লালিত পালিত হয় মহান মহিমা।"[৩৫]

৩৫। Words of Long Ago—P. 52

সাত

কালের ধীর গতির সঙ্গে সঙ্গে এইসব আলোচনাগুলিতে দেখা দিল আরও আগ্রহ, আস্পৃহা ও সংসিদ্ধির মাঝে যে বৃহৎ ব্যবধান তার উপর সেতু-বন্ধনের এবং আন্তর ও বহির্জীবনের পূর্ণমিলনের এবং ব্যক্তি-মানুষকে বৃহত্তর সমষ্টিতে সামাজিক কাঠামোয় প্রতিষ্ঠিত করার এক তীব্র ইচ্ছা জাগল অধ্যাত্ম-অন্বেষুদের মধ্যে। ক্রমশঃ শ্রীমার নির্নিমেষ অন্তর্দৃষ্টিতে ফুটে উঠল মানুষের ভবিষ্যৎ ভাগ্যের দিক এবং সে ভাগ্যকে দ্রুত সংসিদ্ধ করার কাজে তিনি কি অংশ নেবেন তাও স্থির করে ফেললেন। ১৯১২ সালে লিখিত এক স্মারকলিপিতে জানালেন যে—

"সার্ব্বজনীন যে আদর্শ আমাদের লাভ করতে হ'বে তা হ'ল ক্রমস্ফুট বিশ্বজনীন সুষমার আরম্ভ। আর এই আদর্শকে সার্থক করার উপায় হ'ল, পার্থিব জগতের পক্ষে, ব্যক্তিগত জাগরণের মধ্য দিয়ে মানবীয় একত্ব সংসাধন করা এবং সেই একম্ অদ্বিতীয়ম যা অন্তরের ভগবান, তাঁকেই ব্যষ্টিগতভাবে প্রকাশ করা।

অন্য কথায় সকলের অন্তরস্থ ভগবানের রাজ্য আবিষ্কার করে এক একত্ব সৃষ্টি করা।"৩৬

ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্তরে ঘটাতে হবে এক মহান পরিবর্ত্তন—এক পরম রূপান্তর; এসব স্তর আবার এক

৩৬। Words of the Mother, (1946) P. 5

পরিপূর্ণ সর্বসুষমার সঙ্গে মিলে মিশে অখণ্ড হয়ে থাকবে। শ্রীঅরবিন্দের একটি কবিতায় রাজাকে সনির্বন্ধ মিনতি করছেন মেরুপ্রান্তিক দ্রষ্টা—

এই মর্ত্যের উপর তার সন্ধান কর। তিনি সাজিয়েছেন
বিরাট পরম্পরা ধরে
এই নানা ভুবন তোমারই জন্যে, মানুষের সফলতা লাভের
উদ্দেশ্যে এই প্রবল রাজত্ব গড়ে তুলতে,
যে মানুষ উৎসুক তাঁর আদর্শে পৌঁছাতে। নিজের মানবী
শক্তি পূর্ণ করে তোল,
পূর্ণ সার্থক কর বিশ্বমানবকে।[৩৭]

ব্যষ্টি সমষ্টিকে প্রভাবান্বিত করে এবং সমষ্টি ব্যষ্টির উপর প্রভাব বিস্তার করে; তাই বাঞ্ছিত রূপান্তরকে গড়ে তুলতে হবে অনুপূরক ধারা ধরে। ব্যক্তির আন্তর সম্পূর্তির নির্ধারক হ'ল ভগবানের সাথে উত্তরোত্তর একত্ব বৃদ্ধি কিন্তু তার অর্থ নয় জীবন পরিহার করা, পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। সমষ্টির একতা ও শক্তির উৎস হল ব্যষ্টির আত্ম-সমাহিত একতা ও স্বোপার্জিত শক্তি। শ্রীমা বলেন, "সত্যকার ক্রমোন্নতি, মানুষকে যা নিয়ে চলে তার জন্মগত অধিকার সুখের অভিমুখে তা কোন বাহ্য উপাদানের, কোনো পার্থিব সমৃদ্ধি অথবা সামাজিক পরিবর্ত্তনের উপর নির্ভর করে না; ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গীণ—আভ্যন্তরিক ও গভীর উৎকর্ষতাই যথার্থ উন্নতি, তা-ই পারে বর্ত্তমান সকল অবস্থার ব্যবস্থার রূপান্তর

৩৭। Collected Poems & Plays Vol. I P. 162

ঘটাতে, দুঃখ দৈন্যকে পারে প্রশান্ত এবং স্থায়ী পরিতৃপ্তিতে পরিবর্ত্তিত করতে।"[৩৮] রেনার মারিয়া রিল্‌কে বলেন—

"প্রিয়তম, তোমার অন্তরে ছাড়া বিশ্বভুবন আর কোথাও নেই। রূপান্তরের ফেরে বয়ে চলে এ জীবন। চির বিলীয়মান বাহ্যবস্তু যা কিছু তা লুপ্ত হয়ে যায়।"[৩৯]

আলোই ডাকে আলোকে এবং জীবন্ত সর্বজীবের হৃদয়ে প্রজ্‌জ্বলিত দিব্য আলো এক অভিন্ন,—"এর থেকে প্রমাণ হয় সকলের মূল—একত্ব, তাদের পরস্পরের মধ্যে সংহতি ও সৌভ্রাত্র্য।"[৪০] মানুষ যদি ব্যক্তিগত যুদ্ধে জয়ী হয় তাহ'লে বেশ জনকতক অধ্যাত্মভাবে মুক্ত ও আলোকিত পুরুষ ও নারীর সম্মেলন সম্ভব এবং তাতেই কার্য্যত সমষ্টিগতভাবে "নবজাতির, ভাগবত সন্তানের জাতির, প্রস্ফুটনের জন্য অনুকূল কোন এক স্থানে আদর্শ সমাজ"[৪১] গড়ে তোলা যাবে।

এই হল আশা, এই হ'ল কর্ম্মপ্রণালীর নক্সা। ভিতরে আলোর উদ্ভাস হবে সেই মূল ভিত্তি যা বহন করতে পারবে ভাবী দিব্য সমাজের, অতিমানব সমাজের, ভগবানের অগণ্য সন্তানদের ভার।

যদি আন্তর উদ্ভাস, পূর্ণ রূপান্তর হয় প্রধান লক্ষ্য, তাহ'লে

৩৮। Words of the Mother, 1946 p. 5

৩৯। Collected Poems & Plays vol. I p. 162

৪০। Words of Long Ago p. 90

৪১। Translated by J. B. Leishman & Stephen Spender

তাকে খুঁজতে হবে তাতেই সন্তুষ্ট ও নিবদ্ধ থাকবার লক্ষ্য হিসাবে নয় বরং আর এক পূর্ণতর পরিণতির উপায় হিসাবে —এই সকল জ্যোতিরুদ্ভাসিত সিদ্ধ ব্যষ্টিগত কেন্দ্র থেকে জ্যোতি বিকীর্ণ হয়ে পরিবেশেরও ঘটবে রূপান্তর। মানুষ যেমন আছে তা নয়, অহমিকাপূর্ণ অসার বস্তুর পিণ্ড বা পাকেচক্রের দাস বিদ্রূপ নয়, লোভ, ক্ষয়, অশক্তির আর্ত্ত-নাদরত উত্তরাধিকারী নয়, বরং মানুষ যা হয়ে উঠবে তাই— যে মানুষ অন্তরের সুপ্ত দেবত্বকে ফিরে পেয়েছে—তারাই সংযোগ স্থাপনা করবে তোমার সহধর্ম্মীদের সঙ্গে যারা এমনিই মুক্ত পুরুষ—উভয়ের মধ্যে রচিত করবে এক সম্যক সৌমনস্য। এই অধ্যাত্মভাবে আত্মজয়ী ও মুক্ত পুরুষ ও নারীর জগতে পরস্পরের মধ্যে বোঝাবুঝির মাধ্যম হবে আত্মার প্রসারতা ও বিশ্বব্যাপিতা।

"অন্তরস্থ ভগবানের সাথে যখন তুমি একাত্ম তখন সকলের সঙ্গে তাদের অন্তরের গভীরে যুক্ত সেই তৎপুরুষের সাহায্যে তারই মধ্যে দিয়ে সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে তোমাকে। তখন থাকবে না কোন আকর্ষণ, কোন বিকর্ষণ, থাকবে না কোন অনুরাগ, কোন বিরাগ, তখন শুধু তার কাছে যারা, তারও কাছে হবে তুমি। যারা তার থেকে দূরে, তুমিও হবে তাদের থেকে দূরে।

"কথা তবে এই: সকলের মধ্যে আমাদের হ'তে হবে

৪২। Words of Long Ago p. 89

৪৩। Words of The Mother p. 6

—ক্রমোন্নত মাত্রায়—শারীরিক মানসিক তথা আধ্যাত্মিক একটা পরিপূর্ণ সর্ব্বাঙ্গীণ ক্রিয়ার দিব্য আদর্শ, সকলকে এনে দিতে হবে এমন একটা সুযোগ যাতে তারা বুঝতে পারে গ্রহণ করতে পারে ভাগবত জীবনের পথ।"[৪৪]

তাহলে এই হ'ল অবস্থা: বর্ত্তমান সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও পার্থিব জীবন থেকে পলায়নও থাকবে না, তার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতাও করা চলবে না। যখন অন্তরের উন্নতিতে লিপ্ত হয়ে থাকবে বা যখন উন্নতি সম্পূর্ণ হবে, তখনও কর্ম্মকে পরিহার করা চলবে না। এমন কি 'বদ্ধ' কেও 'বোধি-সত্ত্ব' হতে হবে, কষ্টলব্ধ 'অর্হত্য' স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে ফিরে আসতে হবে জনস্রোতের মাঝে, তাদেরই মধ্যে যারা মূলত তাঁরই মত বোধিসত্ত্ব অথচ ঘূর্ণীয়মান পার্থিব জীবনচক্রের শৃঙ্খলে অন্ধ-ভাবে বাঁধা।

আট

১৯১২ সালে শ্রীমা কয়েকজন সত্যসন্ধানীর কাছে, "যাঁরা নিয়মিতভাবে আত্মজ্ঞান ও আত্মকর্তৃত্ব অর্জনের উদ্দেশ্যে মিলিত হতেন" কতকগুলি রচনা পড়ে শুনিয়েছিলেন। সে রচনার মূল বক্তব্য ছিল কর্ম্মের ব্যবহারিকতার দিকটি। ঐ সকল রচনাবলীর জীবন-কাহিনী হিসাবে বলা হল: "প্রত্যেক বৈঠকের শেষে একটা মোটামুটিভাবে প্রশ্ন থাকত এবং সে প্রশ্নের উত্তর প্রত্যেককে নিজের মতন করে দিতে হ'তো। এই

৪৪। Words of Long Ago pp. 82-83

উত্তরগুলি পড়া হত পরবর্ত্তী বৈঠকে। সকলের শেষে উপসংহার হিসাবে হত একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ। প্রবন্ধগুলি এই।"[৪৫]

প্রথম প্রশ্ন হল: "বিশ্বব্যাপী কর্ম্মের মাঝে আমার স্থান কোথায়?" কর্ম্মকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না কারণ প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মই অপরিহার্য্য; কিন্তু কোন্ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম আমাদের হবে বাঞ্ছনীয়, কোন্ মনোভাব নিয়ে সে কর্ম্ম বা আমরা করব? কর্ম্মবিশেষকে নিকৃষ্ট, উৎকৃষ্ট বা বিশিষ্টের মর্য্যাদা দেয় দেশাচার বা লোকাচার; কর্ম্মের এই শ্রেণী হিসাবে আবার তার পুরস্কার বা পারিতোষিক। এই সব কারণেই মানুষ যে খোঁজে অল্প শ্রমের, কম "অসম্মানী" এবং বেশী লাভজনক ও সম্মানী ধরণের কর্ম্ম তা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তাই সর্ব্বত্রই এত উন্মত্ত হুড়োহুড়ি এবং আত্মঘাতী প্রতিযোগিতা। কিন্তু শ্রীমার কর্ম্মৈষণার সূত্র একেবারে নূতন ধারা থেকে উদ্ভূত:

"প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে একথা কখন না যেন বলি: 'আমি বড়লোক হতে চাই, তার জন্যে কোন্ কাজ হবে অনুকূল? বরং যেন বলি: এমন কোন একটা কাজ আছেই যা সকলের চাইতে আমিই ভাল পারি; কারণ মূলতঃ সকলের মধ্যে রয়েছে যে ভাগবত শক্তি প্রত্যেকে তারই এক এক রূপে প্রকাশ। সেই কাজ যতই তা ছোট হোক বা খাট হোক, আমার ব্রত তাকে আবিষ্কার করবার জন্য আমি আমার রুচি

৪৫। Words of Long Ago P. 53

প্রবৃত্তি, পছন্দ, অপছন্দ পর্য্যবেক্ষণ করছি, বিশ্লেষণ করছি, আর সে কাজ আমি করবো একদিকে অতি বিনয় অন্যদিকে অহঙ্কার বর্জন করে ; অপরের মতামত উপেক্ষা করে। একাজ করে যাব আমি যেমনভাবে শ্বাস প্রশ্বাস নিই, যেমনভাবে ফুল সুগন্ধ ছড়ায় অনায়াসে স্বভাবগুণে, কারণ অন্যরকম করা যে আমার পক্ষে অসম্ভব।' যে মুহূর্ত্তে আমরা সব অহমাত্মক বাসনা, সব ব্যক্তিগত এবং স্বার্থময় উদ্দেশ্য দূর করতে পেরেছি—তা যদি এক পলকের জন্যও হয়—তখনি নিজেদের আমরা দিয়ে দিতে পারি এই অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রবাহের কাছে, এই গভীরতর প্রেরণার কাছে যার সহায়ে আমরা যুক্ত হতে পারব বিশ্বের জীবন্ত এবং ক্রমোন্নত সব শক্তিধারার সঙ্গে।"[৪৬]

এইভাবেই প্রত্যেক কর্ম্মানুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে প্রত্যেক ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য জড়িয়ে আছে, তাই সব কর্ম্মই হয়ে দাঁড়ায় ভগবানের কাছে নিবেদিত আত্মোৎসর্গের নৈবেদ্য। তার পারিতোষিক আমরা যা সঙ্গতভাবে আশা করতে পারি তা হল অন্তরে একটা তৃপ্তিবোধ, কারণ কর্ম্মটি উচ্চই হোক বা নীচই হোক তা শুধু আমরাই করতে পারি, তা সম্পন্ন হয়েছে বা হবার পথে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল : "নিঃস্বার্থ কর্ম্মে আত্মনিবেদনে আমাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বাধা কি ?"

৪৬। Words of Long Ago Pp. 57-58 Prayers and Meditations P. 54 Pp, 109-111

প্রশ্নটি খুবই সঙ্গত, কারণ ব্যষ্টিজীবনের অনুপমতা দৈনন্দিন জীবনের সত্যতাতেই প্রকাশ এবং তাকে ঔদ্ধত্য ও অহমিকার বিবর্ণ পোষাক পরিয়ে ঢেকে রাখা নিশ্চয়ই হয়ে দাঁড়ায় মরণসঙ্কুল। শেষে, এমন কি, ব্যষ্টির এই অনুপমতাও হয়ে দাঁড়ায় এ বিভ্রম—অধ্যাত্ম জীবনের উন্নতির পথে কোন অবস্থায় কর্ম্মানুষ্ঠানের উপযুক্ত সুবিধাজনক পদ্ধতি ছাড়া এ আর কিছুই নয়। শ্রীমা এদুটি অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রকে সামঞ্জস্যে পরিণত করার যে সঠিক পথ একটি নির্দ্দেশ করেছেন তা হল ঃ

"ব্যক্তিত্বের ভ্রম যখন বলি তখন তার অর্থ আমি বলিনা এই যে প্রত্যেক ব্যক্তির নেই নিজস্ব প্রকাশ ভঙ্গি। বৈশিষ্ট্য আর বিভাজন এক জিনিষ নয়।...মনে করা যাক আমরা প্রত্যেকে যেন একটি অতি বৃহৎ জীবদেহের এক একটি কোষ, তাহলে অচিরেই বুঝব যে একটি কোষের প্রাণ অন্যদের প্রাণের উপর নির্ভর করছে, যদিও সমস্তের মধ্যে তার আছে বিশেষ ভূমিকা তবু একমাত্র নিজের প্রাণ বিপন্ন করেই অপরের কাছ থেকে সে বিচ্ছিন্ন হতে পারে।"[৪৭]

"...নির্ব্যক্তিকতা অর্থ কাজের মধ্যে নিজেকে শুধু ভুলতে পারাই নয়, নিজেকে যে ভুলে যাচ্ছি তা পর্যন্ত মনে না রাখা।...কাজ তখনই করা যেতে পারবে অবাধ স্বতঃস্ফূর্ত্ত-ভাবে, তার সর্ব্বাঙ্গীণ সুসম্পূর্ণতা রেখে।"[৪৮]

৪৭। Words of Long Ago P, 62
৪৮। Words of Long Ago P, 67

আর একটা জিনিষ: শহিদ সাজবার একটা সস্তা লোভ খুবই দেখতে পাওয়া যায়। আমরা কথায় কথায় শ্যামদেশীয় যমজের মতোই "সেবা ও আত্মবলি" কথাটি বেশ ফাপিয়ে রসিয়ে বলি। উদাসপ্রবণ বেদনাবরণের সত্য প্রয়োজন আছে কি? এ কি জ্ঞানের পথ? এ হচ্ছে সহানুভূতিমূলক ধর্ম্ম-ঘটের মত সহানুভূতিজনক আত্মোৎসর্গ যা কোনও স্থির লক্ষ্যে পৌঁছে দেয় না আমাদের। সত্যকারে যা ঘটে তা হচ্ছে "সজ্ঞানে হোক বা অজ্ঞানে হোক পরের উপকারের জন্য তোমার আত্মবলি আত্মবলি নয়, তোমার আত্মবলি হল বলিদানের আনন্দের জন্য—এর কোন উপকার নেই। কারো এতে উপকার নেই। কারো এতে উপকারও হয় না।"[৪৯] শ্রীমা তাই এক বলিষ্ঠ, আরও মানবীয় এবং আরও বেশী ফলপ্রদ কর্ম্মের যে নিশানা স্পষ্ট করে ধরেছেন তা হল:

"বস্তুতঃ, সত্তার মধ্যে প্রকৃত চৈত্যপুরুষের প্রকাশ হল শান্তি, প্রফুল্লতা প্রসন্নতা। বেদনা তাহলে, তা সে যে রকমেরই হোক, স্পষ্ট দেখিয়ে দেয় ঠিক আমাদের যে-দুর্ব্বল জায়গাটি···মানুষের সত্যকার সাহায্যে আসবার একমাত্র উপায় হল তাদের দুঃখ কষ্টের সম্মুখে এনে দাঁড় করান একটা প্রফুল্ল প্রশান্তি নির্ব্ব্যক্তিক প্রেমের তা হবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষী প্রকাশ।"[৫০]

এরপর আরও বলা যায় যে যেহেতু সংঘর মধ্য দিয়ে বেশী

৪৯। Words of Long Ago p, 66

৫০। Words of Long Ago pp, 66-67

"কাজ" করার জন্যে কাজ খোঁজা হয় এবং যেহেতু ভাব ও ভাষা সাহায্য করে সংঘকে সুচারুরূপে চলতে, তাই তাদের সম্পর্কে শ্রীমা তাঁর অমূল্য নির্দ্দেশ দিয়েছেন। সংঘগুলি কখনও যেন অচলায়তন না হয়; তারা কাজ করে যাবে অবাধে, প্রকৃতির গুপ্ত শক্তি প্রবাহের ধারা বেয়ে; যদি ব্যক্তিগত সম্পর্কের বলয়গুলি হয় সুদৃঢ়, তা'হলে সে সংঘের গোটা শৃঙ্খলটাই হয়ে উঠবে শক্তিশালী। এক কথায় "এ পৃথিবীতে আমরা সৃষ্টি করতে চাই যে সমষ্টিজীবন, এস আমরা প্রত্যেকে তার এক একটি জীবন্ত কোষ হয়ে উঠি।"[৫১] চিন্তাধারার উপর পূর্ণ কর্ত্তৃত্বের কথা এই যে, সঠিক শৃঙ্খলা সে পাইয়ে দিতে পারে এবং ভগবানের কাছে অকৃত্রিম সমর্পণের চাই এই শৃঙ্খলাবোধের সাথে, যাতে আমরা হয়ে উঠতে পারি তাঁর হাতে নমনীয় মৃৎপিণ্ডের মত।

সব শেষে, বাক্য ব্যবহার সম্বন্ধে শ্রীমার সতর্কবাণী আছে —অতি উপযুক্ত সতর্কবাণী—বাক্য-অপব্যবহারে বিরুদ্ধে। শব্দ নিজে ততটাই মূল্যহীন যতটা নিষ্প্রাণ বৈদ্যুতিক ব্যাটারি। শব্দ ব্যবহার করে যে, তারই ব্যক্তিত্বের শক্তিতে হয় তা শক্তিশালী। শব্দই শক্তি, তাই তার অপব্যবহার যেন না করি বা তাকে নিরর্থক করে না তুলি।

৫১। Words of Long Ago p. 70

নয়

বিরাট আন্তর পরিবর্ত্তন ও উন্নতির দ্বারপ্রান্তে এসে—অধ্যাত্মের ভাষায় তা এক বিপ্লব ও রূপান্তর—আসন্ন আন্তর পরিবর্ত্তনের প্রস্তুতির জন্য ও আধ্যাত্মিক গঠন ও উন্নতির গতি ত্বরান্বিত করার জন্য শ্রীমা দলগত আলোচনার পরিবর্ত্তে খুঁজলেন অন্য উপায় যা রীতিমূলক প্রচারের চেয়ে অনেক বেশী জীবন্ত ও সূক্ষ্ম। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য শ্রীমার এই নব যন্ত্র—নব যন্ত্র এই অর্থে যে তা বারংবার ও পূর্ণভাবে কার্য্যকরী করা হয়েছে—তা হ'ল তাঁর ধ্যান ও প্রার্থনা। অধ্যাত্ম অন্বেষুর কাছে এই সকল "প্রার্থনা" শুধু বস্তুপ্রাপ্তি বা সুবিধার উদ্দেশ্যে সামান্য ভিক্ষাবৃত্তি নয়—যেমন, ভোট বা পরীক্ষায় সাফল্য, বাণিজ্যে সমৃদ্ধি, দৈহিক কষ্টের উপশম ইত্যাদি। প্রার্থনার গভীরতর উদ্দেশ্য আছে, আর তাই অধ্যাত্ম এষণায় পরিপূর্ণ যারা, যারা সুদূর লক্ষ্যে সচেতন, তারা আধিভৌতিক শক্তিকে প্রার্থনার প্রভাবের দ্বারা প্রচালিত করে। বাস্তবিকই প্রার্থনা এক অবর্ণনীয় সঙ্গীত যা তিনটি উদাত্ত স্বরের সমন্বয়ে উদ্‌গীথ—আরাধনা, সাযুজ্য, সহযোগিতা—এবং এই প্রার্থনাপূর্ণ আনন্দের তরঙ্গ জানতে পারে।

"সর্ব্বপ্রথম, অলৌকিক ভগবৎ সদ্‌বস্তুর দিকে আমাদের ব্যক্তিগত প্রবেশাধিকার ও আত্মস্থতা, তারপর এই সম্ভাব্য প্রবেশাধিকারের জন্যই অলৌকিক ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠার সকল

সম্ভাবনা ভগবানের প্রয়োজনীয়। সর্ব্বশেষে এই কারণেই আমাদের সকল ক্ষমতাই আরোপ করা হয় অন্য সকল ব্যক্তিত্বের উপর। কারণ এই সব আরাধনার অবস্থাই আত্মাকে স্বর্গীয় দ্বার খুলে দেয় এবং তার দিব্য ইচ্ছাশক্তি ও ভালবাসা আরও বেশী করে অধিকার ও শাসন করে ও এক প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয় পরে যা রূপান্তরিত হয় এক অন্তরঙ্গ সহযোগিতায়, সীমাহীন উদ্দ্যমপূর্ণ শক্তিতে। যে আত্মা দৈবের পূর্ণ আধার, সহজ কথায় সে অশেষ, কারণ তার সকল কর্ম্মই দিব্যত্বপ্রাপ্ত হয়।"[৫২] কবি কোলরিজ যখন বলেন—

তরুণী সন্ন্যাসিনীর মতো,
নিরাভরণ রিক্ততায় ঘেরা অপরূপ।
তার সর্ব্বদা প্রার্থনা, প্রার্থনা সুপ্তির মাঝে।

তিনি এই অবস্থাকে বর্ণনা করে বলেন যে এ হ'ল প্রার্থনার মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন সহযোগ। অধ্যাত্ম অন্বেষুর কাছে সমস্যা হল প্রার্থনার গভীরতা ও তার এলাকাকে প্রসারিত করা, হৃদয়ের সাময়িক বিচ্ছিন্ন, অশুভ আবেগকে আত্মার স্থায়ী, অচঞ্চল সর্ব্বব্যাপী উপাদান করে তোলা, যা সূক্ষ্মভাবে সকল কর্ম্ম, সকল আনন্দ ও দেহ, হৃদয় এবং মনের শতধারাকে প্রভাবান্বিত ও রূপান্তরিত করে। প্রার্থনাকারী ও প্রার্থনার অনির্ব্বচনীয় বস্তুর মধ্যে একটা আশ্চর্য্য যোগ আছে। শ্রীঅরবিন্দ বলেন "যে বরণ করে অসীমকে, অসীম

৫২। Evelyn Underhill, "Man and the Supernatural" (1927) Pp. 204-205

তাকেই বরণ করেন।"[৫৩] ডাঃ ইংগে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ইংরাজ যোগী নরউইচের জুলিয়ানার Revelations (রেভেলেশন্‌স্) থেকে যে কিয়দংশ উদ্ধৃত করেছেন তা খুবই অর্থপূর্ণ

"আমাদের প্রভু আমাকে বলেন, 'আমিই তোমাদের প্রার্থনার মূল কারণ ; প্রথমতঃ, এ আমারই ইচ্ছা ; তারপর আমিই তোমার মধ্যে ইচ্ছাকে প্রবুদ্ধ করি, পরে এই আবেদনকে সঞ্জীবিত করি এবং তাতেই তুমি জানতে পার প্রার্থনা। তাহলে এ কেমন করে হতে পারে যে তোমার মধ্যে বিনতি আসবে না ?' যা কিছুর জন্যে করুণাময় ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা করান, তা তিনি যুগযুগান্তর আগে থেকে নিজেই আমাদের দিয়ে রেখেছেন।"[৫৪]

প্রার্থনার সময় আমরা দুটি হাত তুলে ধরি—স্বেচ্ছায় এবং তা প্রত্যক্ষ ; তবুও ("একমাত্র সত্য হল যে সর্ব্বগামী ঈশ্বরই তাঁর গোপন বিনম্র চাপ দিয়ে মানুষের মধ্যে ইচ্ছাশক্তি ও ভালবাসার গতির সর্ব্বপ্রথম আলোড়ন আনেন)।"[৫৫] স্বতঃ-স্ফূর্ত্ততাই যথেষ্ট সত্য, কিন্তু তাই একান্ত বা চূড়ান্ত নয়। প্রার্থনায় 'আমাদের' বাহু তুলে ধরি, আমরা এসব ফুল নিবেদন করি—কিন্তু বাহুদুটি ও ফুলগুলি কি তাঁর থেকে পৃথক কোন অস্তিত্ব আছে ? যোগীদের প্রিয় একটি পরিচিত

৫৩। The Synthesis of Yoga, Part I, P, 2

৫৪। Christian Mysticism (1925) P, 204

৫৫। Evelyn, Underhill, "The Golden Sequence" (1232) P, 150

উপমার উত্থাপন করে সেণ্ট তেরেসা বলেন, "আমাদের আত্মা হল যেন একটা অকর্ষিত ও ঊষর উদ্যান, আগাছায় জঙ্গলাকীর্ণ; ভগবান আগাছা উপ্‌ড়ে ফেলেন এবং তারপর আমাদের প্রার্থনার জলধারা দিতে হবে গাছে ও ফলে। এই প্রার্থনা, এই আধ্যাত্মিক আহার্য্য, চার প্রকারের: গভীর কূপ থেকে তুমি জল টেনে তুলতে পার; চাকার চারদিকে বাঁধা বালতির সাহায্যে জল তুলতে পার; একটি নালা বা জলধারা বাগানের মধ্যে দিয়ে বইয়ে দিতে পার; কিম্বা আকাশবাসী বৃষ্টিকে ডাকতে পার। কোন বুদ্ধিমান মালী এসব উপায়ের কোনটিকে অবজ্ঞায় পরিহার করবে না, কারণ সবগুলিরই উপকার আছে, কিন্তু আকাশ থেকে বর্ষণই অন্য সবগুলিকে সার্থক করে, তাই এই উপায়টিই হ'ল সবচেয়ে বেশী ফলপ্রদ ও অমৃতোপম।"

ধ্যানের নিয়ন্ত্রণ-রীতি যদিও অন্য রকম তবু তার সঙ্গে প্রার্থনার গাঢ় যোগ আছে; তাদের লক্ষ্য ও কর্ম্মপ্রকৃতি অনুপূরক—তারা একযোগে মানুষকে দেবত্বলাভে ও ভগবানকে মানুষের তনুতে নেমে আসতে সহায়তা করে, মানুষ ও ভগবানের মাঝে অপূর্ব্ব নিবিড়-আত্মীয়তার সম্বন্ধটি গড়ে তোলে। তাতেই ভক্ত ও ভগবানের মাঝে আদান প্রদানের ভাব স্থাপিত হয়, আর স্থাপিত হয় পূর্ণ ঐক্য ও স্থির প্রোজ্‌জ্বল ভ্রাতৃত্ববোধ:

"ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবের সঙ্গে তাদের স্তরে নেমে এসে মিলিত হতে হয়, মানবাত্মা যে আদিম বিস্ময়-বিহ্বল পূজায় বসেছিল,

তাকে এবার তার স্বভাব, স্বভূমি জয় করতে হ'ল। এক অদ্ভুত ও গভীর আত্মীয়তা স্থাপনা হ'ল···এখানেই নম্র এবং ঘনিষ্ঠ, জীবন্ত ও স্বল্পজ্ঞাত ক্ষুদ্রমানবসত্তার বর্ত্তমান ও অসীম সাথীর —মানুষের হৃদয়ের সীমিত দেউলে তার বুদ্ধির নাগালের বাইরে 'নিবিষ্ট' পরমের' সঙ্গে এক মিলন সাধনে প্রার্থনার রূপান্তর ঘটানোর কতখানি ক্ষমতা তা স্পষ্ট দেখা যায় মানুষী ব্যক্তির আধারে।"[৫৬]

তাই প্রার্থনাকে বলা হয় দাদন—তা অসীমের সাথে বাস্তব ঘনিষ্ঠতা ও অনুকম্পাপূর্ণ ধ্যানমগ্ন একময় জীবনের সম্ভাবনাকে অমোঘ করে তোলে, তা একটুও অসঙ্গত নয়। তবে, "প্রার্থনা"র সঙ্গে "ধ্যানে"র যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে —সে সম্বন্ধে বেশি কোন অকাট্য নিয়মের বাড়াবাড়ি করার প্রয়োজন নেই—যা স্মরণ রাখা বেশী প্রয়োজন তা হল ধ্যান ও প্রার্থনা এ-দুটি আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

৫৬। Evelyn Underhill, "Man and the Supernatural" Pp, 216-217

দশ

১৯১২ সালের শেষ দিকে শ্রীমা যখন দৈনন্দিন "ধ্যান ও প্রার্থনা" লিপিবদ্ধ করতে শুরু করলেন, তখনই তিনি আধ্যাত্মিক উপলব্ধি এবং আধিভৌতিক জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় অনেক উর্দ্ধে উঠে গেছেন। হয়ত ইংরাজী অনুবাদ মূল ফরাসীর মত সরল সৌন্দর্য্য, অবশ্যম্ভাবী শব্দবিন্যাস ও বাধ্যতা-মূলক ছন্দ-ঝঙ্কার-বিহীন। কিন্তু এই অনুবাদের কাজটি অনেক -খানি দরদ দিয়ে করা হয়েছে এবং অনুবাদক মূল ফরাসীর প্রাণস্পন্দ, তেজস্বিতা ও সুস্বাদ-সুরভি বজায় রেখেছেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে মাত্র ১৯৪৮ সালে মুদ্রিত শ্রীমার "ধ্যান ও প্রার্থনা" পুস্তিকাটির বর্ত্তমান সংস্করণ খুবই আকর্ষ-ণীয় এবং প্রেরণাদায়ক, এমন কি সাহিত্যে ও অধ্যাত্মে এ হল এক অমূল্য সম্পদ।[৫৭]

এই সকল জ্ঞানদীপ্ত আলোড়নকারী ধ্যান ও প্রার্থনাগুলির তীব্র শুদ্ধতা পরিলক্ষিত হয় সর্ব্বপ্রথম

৫৭। শ্রীঋষভচাঁদ বলেন "এই প্রার্থনাগুলি শুধু কাল্পনিক আদর্শ-বাদের চিক্‌মিকে চুমকির বুনানী নয় বা ঈশ্বরতত্ত্ব নিয়ে গুরুগম্ভীর বাকপটুতা নয়, বরং অধ্যাত্ম অনুভূতির অনস্বীকার্য্য সত্য—দৃষ্টসত্য শ্রুতবাণী, স্পর্শগ্রাহ্য আকার, আমাদের বাহ্য অনুভূতির গোচর স্থূলবস্তুরই মত, অথচ সব এক বা নানা জ্যোতির্ম্ময় জগতে, যাঁ আবার ইন্দ্রিয়সর্ব্বস্ব মানব চেতনার কাছে অগম্য"।—In the Mother,s Light : ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৬

লিপিকা থেকেই, যার তারিখ হ'ল ১৯১২ সালের ২রা নভেম্বর ঃ

"পরম বিধাতা, সকল জিনিসের জীবন তুমি, জ্যোতি তুমি ; প্রেম তুমি। আমার সমস্ত সত্তা ভাবে তোমার কাছে নিবেদিত বটে, কিন্তু কাজে ছোটখাট ব্যাপারে এ নিবেদনের প্রয়োগ আমার পক্ষে এখনও কষ্টকর। আমার এই লিখিত ধ্যানের হেতু ও সার্থকতা ঠিক এইখানে যা তা প্রতিদিন তোমারই উদ্দেশ্যে নিবেদিত। এ কথা বুঝতে আমার দরকার হয়েছে কয়েক সপ্তাহ। প্রতিদিনই তা হ'লে এই রকমে তোমার সঙ্গে আমার প্রায়ই যে আলাপ হয় তার কিছু একটা স্থূলরূপ দিয়ে ধরতে পারব। যথাসাধ্য আমি তোমার কাছে সব খুলে বলব—এ বিশ্বাস নয় যে তোমাকে নূতন কিছু বলতে পারব—তুমিই তো সব জিনিস কিন্তু এই জন্যে যে আমাদের বুঝবার যে বহির্মুখী ও কৃত্রিম ধারণা তা তোমার কাছে অপরিচিত,—আদৌ যদি এ কথা বলা চলে– তা তোমার প্রকৃতির বিপরীত। তা হলেও তোমার দিকে যখন ফিরে দাঁড়াব, এ সব জিনিস দেখবার সময় তোমার আলোকে নিজেকে যখন অভিষিক্ত করব, দেখতে পাব ক্রমে তারা তাদের সত্যকার স্বরূপের মত হয়ে উঠছে। একদিন শেষে আসবে যেদিন তোমার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ এক হয়ে যাব, তখন আর তোমাকে কিছু বলবার আমার থাকবে না, কারণ আমি তো তুমিই হয়ে যাব। ঠিক এই লক্ষ্যেই তো পৌঁছতে চাই। ঠিক এই বিজয়ের দিকেই তো আমার সকল প্রয়াস

আমি নিয়োগ করতে চাই। সেদিনের অপেক্ষায় আমি রয়েছি যেদিন আমি আর "আমি" বলতে পারব না, কারণ, আমি হয়ে যাবে তুমি।"[৫৮]

এই ভাবে দৈনন্দিন ভগবৎ-সান্নিধ্যের মূলভিত্তি, সক্রিয়তা অবিচ্ছিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'তে লাগল, এরপর থেকে আলোর ঝরণা-ধারায় উৎসারিত হ'তে লাগল অনায়াসে আস্পৃহা। আরাধনা, সম্মিলন ও আধ্যাত্মিক কর্ম্ম—সত্যই এ হ'ল ঈশ্বরের অফুরন্ত ঐশ্বর্য্যের এক অত্যাশ্চর্য উৎক্ষেপ। সমৃদ্ধ আত্মার খনি থেকে উপমারাজি সংগ্রহ হ'তে লাগল, অপূর্ব্ব প্রজ্ঞার ভিড়, সুসঙ্গত যুক্তির কণ্ঠহার, আনন্দের পাত্র থেকে আকণ্ঠ পান, অন্তরাত্মার স্ফুলিঙ্গ ফোয়ারা যখন তাকে নেহাইয়ের উপর রেখে তাকে শুদ্ধ ও রূপান্তর করার প্রয়াস চলে—এ সবই শ্রীমার দৈনন্দিন জীবনের ধ্যান ও প্রার্থনার সহজ কথা। এগুলি তাঁর আপন প্রয়াসের দিনলিপি ও দলিল, সনির্ব্বন্ধ মিনতি, অলৌকিকের চকিত দর্শন, আংশিক উপলব্ধি, পুরাতনের পুনর্দর্শন এবং আরো নূতনের দর্শন এবং যতই আমরা ধ্যান ও প্রার্থনার স্বর্ণধারা অনুসরণ করতে থাকি, ততই আমরা এই প্রসারণ ও উর্ধ্বায়ন ক্রিয়ার অংশ গ্রহণ করি, গ্রহণ করি আর এক জগতে এই লোকোত্তর জ্যোতি ও জীবনের কিছু যা এই জগতেরই গহনে, কোথাও যতই ভিতরে আবৃত ও কুণ্ডলীকৃত হয়ে থাকুক।

শ্রীমা ১৯শে নভেম্বর ১৯১২ তারিখ দিয়ে লিখলেন :—

৫৮। Prayers and Meditations p. 1-2

"এই যে ইংরেজ ছেলেটি এতখানি আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তোমার অনুসন্ধানে চলেছে, তাকে কাল আমি বলেছি—তোমাকে আমি চিরতরে পেয়েছি, তোমার আমার সংযোগ নিরন্তর ; বাস্তবিকই এই হ'ল আমার অবস্থা, যতদূর সে-সম্বন্ধে আমি সচেতন। আমার সকল চিন্তা চলেছে তোমার দিকে, আমার সকল কর্ম্ম তোমার কাছে উৎসর্গীকৃত। তোমার উপস্থিতি আমার কাছে ধ্রুব অটুট, অচঞ্চল, বাস্তব ; তোমার শান্তি আমার হৃদয়ে নিরন্তর বিরাজমান।"[৫৯] যদিও তথাপি ছিল সেখানে "মিলন", একান্ত একাত্মতার উপলব্ধি তখনও আসেনি ; কিন্তু কালে তাও আসবে, কারণ বিশ্বাস সেখানে অক্ষুণ্ণ, অনাতঙ্ক। তাই শ্রীমা তাঁর বিশুদ্ধ বিশ্বাস নিয়ে বারংবার ঘোষণা করে বলেন :

"সব তুমি, সর্ব্বত্র তুমি, সবের মধ্যে তুমি। এই যে দেহ কাজ করছে, সমগ্র দৃশ্যমান বিশ্বের মতই তা ঠিক তোমার নিজের দেহ। তুমি শ্বাস ফেলছ, চিন্তা করছ, ভালবাসছ এই সত্তাটির মধ্যে—সে-সত্তা তুমিই, তাই সে হতে চায় তোমার অনুগত দাসী।"[৬০]

"তুমি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা—কেবলমাত্র তুমিই, রূপে ও স্বরূপে।"[৬১]

(অভীপ্সা, বিশ্বাস, সমর্পণ) এ তিনটি হল উপলব্ধির সেতু-

৫৯। Prayers and Meditations p. 3

৬০। Prayers and Meditations p. 3

৬১। Prayers and Meditations p. 4

নির্ম্মাণের প্রসারিত খিলান। শ্রীমা লিখলেন, "আমি তোমার মধ্যে ডুবে যাই, হারিয়ে যাই, শিশুর নির্ভর নিয়ে অপেক্ষা করি তোমার কাছে অনুপ্রেরণার জন্যে, সামর্থ্যের জন্যে যাতে আমার ভিতরকার, আমার চারিদিকের ভুল শুধরে উঠে—ভিতর আর চারিদিক তো একই জিনিস; কারণ, এখন আমি নিরন্তর সুস্পষ্ট দেখতে পাই বিশ্বব্যাপী ঐক্যই সকল ক্রিয়াবলির মধ্যে পরস্পরের একান্ত নির্ভরতা বিহিত ক'রে দিয়েছে।"[৬২] ঠিক একমাস পরেই ৩রা ডিসেম্বর ১৯১২ সালে আবার শ্রীমা লিপিবদ্ধ করলেন: "কালরাত্রে আমি পরীক্ষা করলাম তুমি যেমন চালাও তেমনি নির্ভর করে নিজেকে ছেড়ে দিলে কি সুফল তার হয়। যে-জিনিস যখন জানা প্রয়োজন তা ঠিক তখনই জানা যায়; তোমার জ্যোতির দিকে ফিরে মন যত নিশ্চল থাকে, প্রকাশও তার মধ্যে হয় তত সুষ্ঠু ও সুস্পষ্ট। আর শঙ্কা নাই ক্ষোভ নাই—আছে কেবল পরম প্রসন্নতা, চরম নির্ভর আর নির্ব্বিচল শান্তি।"[৬৩]

দুদিন পরেই আবার লিখলেন শ্রীমা: "ত্বরা নয়, চিন্তা নয়, কৃচ্ছ্রতা নয়; এক তুমিই, তুমি ছাড়া আর কিছুই নয়; তবে বিশ্লেষণ করে, জ্ঞানের বিষয় করে তোমাকে পাওয়া নয়— তুমি রয়েছ কিছুমাত্র সন্দেহ তাতে নাই, কারণ, সব সেখানে হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ শান্তি, দিব্য নীরবতা।"[৬৪] এই

৬২। Prayers and Meditations p. 2

৬৩। Prayers and Meditations p. 7

৬৪। Prayers and Meditations p. 8

শান্তি ও নীরবতা, এক নিরবচ্ছিন্ন পরিপূর্ণতার যে ভাব তা আরও কিছুদিন পর্য্যন্ত অব্যাহতভাবে চলতে লাগল এবং বাণীগুলিও আপন ব্যাকুলতায় ভরে উঠল :

"শিখা যেমন জ্বলে নির্ব্বাক হয়ে, সুবাস যেমন উর্দ্ধে ওঠে নিষ্কম্পভাবে, আমার ভালবাসাও তেমনি চলে তোমার দিকে। শিশু যেমন তর্ক করে না, কিছুরই জন্য চিন্তাও করে না, আমিও তেমনি তোমাতে নির্ভর করি, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, তোমার আলো ফুটে উঠুক, তোমার শান্তি ছড়িয়ে পড়ুক, তোমার ভালবাসা জগৎ ছেয়ে দিক।"[৬৫]

"গতকাল আমার বাণীর মধ্যে দিয়ে তোমার আলো অবাধে প্রকাশ হয়েছে ; যন্ত্র হয়েছে সুনম্য, অনুগত, শাণিত। সকল জীবে, সকল বস্তুতে তুমিই ত কর্ম্ম করে চলেছ ; আর যে তোমার এত সান্নিধ্যে এসেছে, যাবতীয় কর্ম্মে কেবল তোমাকেই দেখতে পায়, সে-ই তো পারে সকল কর্ম্মকে তোমার আশীর্ব্বাদে রূপান্তরিত করতে।"[৬৬]

৬৫। Prayers and Meditations p. 8

৬৬। Prayers and Meditations p. 9

এগারো

১৯১২ সালের ১১ই ডিসেম্বর থেকে ১৯১৩ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখের মধ্যে প্রায় দু'মাসের দীর্ঘ ব্যবধান। শেষের তারিখটিতে শ্রীমা শুনলেন যে বাণীতে গীতমধুর কণ্ঠে ঈশ্বর পৃথিবীকে সম্বোধন করে বলেছিলেন এবং তার অনুলিপি এই: "ওগো দুঃখিনী পৃথিবী, মনে রেখো তোমার অন্তরে আমিই রয়েছি, নিরাশ হয়ো না। তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যথা, প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা, তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান, তোমার মর্ম্মের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা, তোমার ঋতুচক্রের প্রত্যেক পুনরাবর্ত্তন, সব জিনিস কোন কিছু বাদ না দিয়ে—তোমার কাছে যা দুঃখের মনে হয় আর যা সুখের মনে হয়, যা মনে হয় কুৎসিত, আর যা মনে হয় সুন্দর, সকলে—সকলে অনিবার্য্যভাবে তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে—আমি অন্তহীন শান্তি, ছায়াহীন আলো, ছেদহীন সম্মিলন, একান্ত নিঃসংশয়তা, বিশ্রান্তি,—পরম আশীর্ব্বাদ।"[৬৭]

জড় প্রকৃতি একদিন পরাপ্রকৃতি হয়ে উঠবে, সুতরাং নৈরাশ্যের কোন কারণই নেই; আর শ্রীমার কৃতজ্ঞতাও উর্দ্ধে উঠে চলেছে তাঁরই দিকে "ভারতবর্ষের সুগন্ধ বিশুদ্ধ ধূপশিখার মত"।[৬৮] শ্রীমা এও উপলব্ধি করলেন তাঁকে সাগ্রহে

৬৭। Prayers and Meditations pp. 10-11

৬৮। Prayers and Meditations p. 11

অনুসন্ধান করার চেয়ে অটুট বিশ্বাস নিয়ে তাঁর প্রতীক্ষায় থাকা অনেক শ্রেয়ঃ--কারণ তিনি আসবেন, অবশ্যই আসবেন। তাঁর ক্রমস্ফুট ইচ্ছার চেতনা ও তারই সাথে ক্রমোন্নত একাত্মতার মধ্যে অনুস্যূত রয়েছে সত্যকার স্বাতন্ত্র্য ও সর্ব্বশক্তিমত্তা ও আরও রয়েছে পূর্ণ রূপান্তরের সম্ভাবনা। বিশ্বাস তাঁর অটুট এবং আত্মসমর্পণ জীবনের ধর্ম্ম বলেই পরম সদ্‌বস্তুর প্রজ্ঞান শ্রীমার জীবনে ভিড় করে আসে ও কনকোজ্জ্বল বাণীতে পরিণত হয়।

"ভগবান, ভগবান! সীমাহীন আনন্দপূর্ণ করেছে আমার হৃদয়, আমার মস্তিষ্ক ভরে দিয়ে উল্লাসের উদ্‌গীথ চলেছে তার অপরূপ ঢেউ সব তুলে দিয়ে; তোমার বিজয় স্থির-নিশ্চিত, এই দৃঢ় প্রত্যয়ের মধ্যে আমি পেয়েছি পরমা শক্তির অজেয় শক্তি। তুমি আমার সত্তা ভরে রয়েছ, তাকে সঞ্জীবিত রেখেছ, তার প্রচ্ছন্ন উৎস সব সঞ্চালিত করেছ, তার বুদ্ধিকে আলোকিত করেছ, তার প্রাণকে প্রখর করেছ, প্রেমকে বহুগুণিত করেছ। এখন আমি তাই বলতে পারিনা, আমি বিশ্ব না বিশ্বই আমি, তুমি আমার মধ্যে না আমি তোমার মধ্যে। একমাত্র তুমিই রয়েছ, সবই তুমি, তোমার অসীম করুণার উচ্ছুসিত ধারা জগৎকে পরিপূর্ণ করেছে, ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে"।[৬৯]

"আমার অন্তর থেকে উঠছে একটি গীত, গম্ভীর গভীর প্রসন্ন সূক্ষ্ম—জানিনা সে-গান আমার থেকে তোমার দিকে

৬৯। Prayers and Meditations p. 14

যায়, না তোমার থেকে আমার দিকে আসে কিংবা তুমি আমি সারা বিশ্ব মিলে আমরা হলেম এই যে অদ্ভুত গীতটি আমার চেতনায় জেগেছে···পৃথকভাবে আমি নেই, তুমি নেই, বিশ্বও নেই—এ নিশ্চয়।···অনির্ব্বচনীয় শান্তির মধ্যে আত্মহারা আমার আত্মা।”[৭০]

“তুমি যেখানে নাই সেখানে সব নিষ্প্রাণ, নিরেট অচেতন। যা-কিছু আমাদের আলো দেয়, মুগ্ধ করে, আমাদের জীবনের সমস্ত অর্থ, সমস্ত লক্ষ্য তা সবই তুমি। এর চেয়ে আর বেশী কি প্রয়োজন—(সকল ব্যক্তিগত চিন্তা থেকে মুক্ত হলে দু পক্ষ মেলে দিয়ে স্থূল জীবনের যাবতীয় অনিত্যতার উর্দ্ধে বিচরণ করতে হলে—তবেই ত উড়ে যেতে পারি তোমার দিব্য সালোক্যের মধ্যে, পৃথিবীতে আবার ফিরে আসতে পারি তোমার বাণীবহ হয়ে, তোমার আসন্ন আগমনীর অপরূপ বার্ত্তা ঘোষণা করতে)”[৭১]

কোনো কোনো মুহূর্ত্তে পৃথিবীর সসীমতা মানুষের দৃষ্টি-ক্ষীণতা ও আনন্দহীনতা তাঁর চেতনার উপর চাপ দেয় এবং আপশোষের মৃদুস্বরে তিনি বলেন পৃথিবী ও মানুষ এখনও বিকৃতভাবে স্বরচিত ও নিরানন্দ পথে হামাগুড়ি দিচ্ছে :

“ভগবান, আগুন যেমন আলো ও উত্তাপ দেয়, ঝরণা যেমন তৃষ্ণা জুড়ায়, তরু যেমন ছায়া ও আশ্রয় প্রদান করে,

৭০। Prayers and Meditations p. 18

৭১। Prayers and Meditations p. 22

আমি যেন সেই রকম হ'তে পারি···মানুষেরা এত দুঃখী, এত অবোধ তাদের সাহায্যের এত প্রয়োজন।"[১২]

"তবে কেন মানুষ এসব সম্পদ ফেলে চলে যায়, কেন ভয় করে এদের? কি অদ্ভুত এই অজ্ঞান, সকল দুঃখ কষ্টের উৎস যেখানে। কত দীনহীন এই মোহ—মানুষকে তার সৌভাগ্য থেকে আড়াল করে রেখেছে, সাধারণ জীবনের সংগ্রামে দুঃখকষ্টে পরিপূর্ণ এই দারুণ পরীক্ষাগারের মধ্যে দাস করে রেখেছে।"[১৩]

(অধৈর্য্যের তরঙ্গ ও উত্তেজনা কোন সমাধানই আনে না, তথাপি ধৈর্য্য কতই না কঠিন বস্তু। কবি হপ্‌কিন্‌স স্বীকার করে বলেন:

> 'ধৈর্য্য, সে অতি কঠিন বস্তু।···
> স্বাভাবিক হৃদয়ের আইভিলতা ধৈর্য্য ঢেকে রাখে
> অতীতে বিধ্বস্ত আমাদের উদ্দেশ্য যত।
> ওই তো রৌদ্রধারায় পরিস্নাত সে—
> সিন্ধুর নীল আঁখি আর আদ্রব কিশলয়-সাগরে।'

হতে পারে ধৈর্য্য কঠিন বস্তু, কিন্তু শ্রীমার তাইই প্রয়োজন। কারণ তাঁর প্রচেষ্টা হ'ল—সে অগ্নিপরীক্ষা যতই দীর্ঘ বা অল্পক্ষণই হ'ক—আঁধারকে বিদূরিত এবং ক্ষত নিরাময় করা। তা হ'লে যে ধৈর্য্য দুর্ব্বলতা আনে তার কাছে সমর্পণই বা কেন? শ্রীমা মুহ্যমানা হয়ে পড়বেন না, তিনি

১২। Prayers and Meditations p. 15

১৩। Prayers and Meditations p. 16

হবেন নমনীয় ও দৃঢ় প্রত্যয়শীলা; কারণ তাঁর অন্তরের নীরবতায় বেজে ওঠে সেই দৈববাণী :)

"কাজ ভাল করে করবার জন্য উদ্ব্যস্ত হওয়া দুঃসঙ্কল্পেরই মত নিয়ে আসে সমান কুফল, গভীর জলের মত প্রশস্তির মধ্যেই নিহিত সত্যকার সেবার একমাত্র সম্ভাবনা।"[৭৪]

প্রায় দু'মাসের অর্থপূর্ণ বিরতির পর শ্রীমা ৭ই অক্টোবর ১৯১৩ সালে লিখলেন :

"তিন মাস অনুপস্থিতির পর তোমার নামে উৎসর্গীকৃত এই গৃহে ফিরে দুটি উপলব্ধি আমার হল, ভগবান। প্রথমতঃ আমার বাহ্যসত্তায় আমার স্থূল চেতনায় আমি আর আদৌ অনুভব করি না যে আমি রয়েছি আমার নিজের ঘরে, অথবা সেখানে আমি কোনকিছুর মালিক।...দ্বিতীয়তঃ, গৃহখানির সমস্ত আবহাওয়ায় মিশে রয়েছে একটা পুণ্য-গাম্ভীর্য্য—সেখানে প্রবেশ করলেই ডুবে যাই যেন গভীরে। ধ্যান সেখানে হয় নিবিড়তর, মহত্তর।...আমার আধারের নূতন এক দুয়ার খুলেছে, এক বিশালতা এসে দেখা দিয়েছে--সব পরিবর্ত্তিত হয়ে গিয়েছে। সবই নূতন। পুরাতন ছিন্নবস্ত্র সব যেন খসে পড়েছে, নবজাত শিশু চোখ মেলে তাকিয়েছে উদীয়মান উষার দিকে।"[৭৫]

সত্যই সবই পরিবর্ত্তিত হয়েছে—প্রশান্তি এসেছে ও জড়ের মধ্যে স্থায়ী হয়েছে— তবুও বাধা বিপত্তির হঠাৎ ঝাপটা নিঃশেষিত হয় নি। এই প্রসঙ্গে শ্রীমা লিখলেন—

৭৪। Prayers and Meditations p. 19

৭৫। Prayers and Meditations pp. 23-24

"সক্রিয় চিন্তাকে যখন আমরা স্তব্ধ করে রাখি---তুলনায় তা খুব কঠিন নয়--- তখনি দেখি চারিদিক থেকে উঠে আসছে অবচেতনার রাশীকৃত সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছাপ, অনেক সময়ে তা এত পরিপ্লাবী হয় যে আমাদের একেবারে ডুবিয়ে দেয়।"[৭৬]

কি করে এই সূক্ষ্ম সর্পটিকে নির্জীব এবং এমন কি বিনাশ করা যায়? সন্ন্যাসীর কৃচ্ছ্রসাধনায়? শ্রীমা বলেন, 'না': অন্য কোন অভ্রান্ত উপায় নিশ্চয়ই আছে। সে উপায় তিনি আবিষ্কার করবেন অন্তরের অন্তঃস্থলে যে দিব্যদিশারী আছেন তাঁর বাণী শুনে, সেই দিশারী যাঁর মধ্যে রয়েছে "জননীর ষোলো আনা স্নেহ ও শিক্ষকের ষোলো আনা সহিষ্ণুতা।[৭৭]

বারো

জড়ের অচেতনা, গুরুভার, ব্যর্থতা ও পরাজয় মর্ত্ত্যজীবনকে মেঘাচ্ছন্ন করতে থাকে এবং নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে বিবর্ত্তনের পথটি রুদ্ধ করে তোলে। এ সব তামসিকতার দিকে দৃষ্টিপাত করে ব্যর্থতা, সত্যভ্রষ্টতা ও পরাজয়ের সংখ্যা বৃদ্ধিতে শ্রীমা গভীর বেদনা পান। তাই তিনি ২৯শে নভেম্বর ১৯১৩ সালে লিখলেন, "কেন এই কোলাহল, এই আন্দোলন, এই বিক্ষোভ? কেন এই ঘূর্ণি মানুষকে নিয়ে ছুটে চলেছে, ঝড়ের মধ্যে এক ঝাঁক মাছির মত। কি করুণ দৃশ্য—এত শক্তির অপব্যয়, এত পরিশ্রম নষ্ট! পুতুলের মত সুতোর টানে এই যে তাদের নৃত্য

৭৬। Prayers and Meditations p. 25

৭৭। Synthesis of Yoga-Sri Aurobindo, Part I, p. 15

কবে তা বন্ধ হবে—কিন্তু কে বা কিসে তাদের যে ধরে আছে জানেও না তারা।"[৭৮] "অপব্যয়" আমাদের অপরাধজনক অযোগ্যতা ও নির্ব্বুদ্ধিতার এক প্রধান কথা। প্রকৃতির দান, আমাদের নিজস্ব শক্তি, কাল ও সৌন্দর্য্যের অপব্যয় হচ্ছে এবং সবার উপরে যা অপব্যয় হচ্ছে তা হল ভগবৎ-করুণা যাকে প্রত্যাখ্যান পর্য্যস্ত করা হচ্ছে—সেইই মূর্খ ভারতীয়ের মত সত্যভ্রষ্ট মানব আপন হাতে ছুঁড়ে ফেলে "সকলের চেয়ে মূল্যবান মণি"। প্রদীপ্ত সম্ভাবনা ও কঠোর বাস্তবতার মধ্যে ছায়ালোক, তার উপর শ্রীমা সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন, উৎকণ্ঠ হয়ে আছেন কখন ছায়া অপসারিত হবে এবং অজ্ঞানের জগৎকে পুনরধিকার করবে আলো :

"তোমার দিব্য প্রেমের মধ্যে মিশে গিয়ে, আমি দৃষ্টিপাত করি পৃথিবীর উপর, তার জীবকুলের উপর, দেখি এই পদার্থের রাশি নিয়ত রূপ গ্রহণ করে, বিনাশ পায়, পুনরায় নবীভূত হয়, এই যে বহু সমাবেশে স্তূপ সব গড়ে ওঠে, আবার তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে যায়, এই যে সব সত্তা যাদের ধারণা তারা সচেতন শাশ্বত ব্যষ্টিরূপ, বস্তুতঃ কিন্তু তারা একটি নিঃশ্বাসের মতই নশ্বর, সকলেই তারা একই ধরণের, পার্থক্য যতই হোক, তারা সকলে চিরকাল পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করে চলেছে একই সব কামনা, একই সব প্রেরণা, একই সব তৃষ্ণা, সেই একই সব অজ্ঞানাচ্ছন্ন প্রমাদ।"[৭৯]

৭৮। Prayers and Meditations p. 22

৭৯। Prayers and Meditations p. 47

বিশ্বাসঘাতক আনন্দ, নীচতা ও নির্ব্বোধ তৃপ্তির দ্বারা প্রতিপালিত ভীতিপ্রদ উদ্‌ভ্রান্ত নাগরিক জীবন ও তথাকথিত সভ্যতা মানুষকে দৃঢ়ভাবে অভিভূত করে রেখেছে। পরে একদিন শ্রীমা লিখলেন,"এই যে অবাস্তব ব্যক্তিরূপের নিরন্তর ঘূর্ণি, এই যে বহুলতা জটিলতা, এই যে অপরিসীম অশোধনীয় বিশৃঙ্খলা, চিন্তার বিরোধ, প্রেরণার দ্বন্দ্ব, কামনার যুদ্ধ, আমার মনে হয় ক্রমেই অধিকতর নিদারুণ হয়ে উঠছে। এই যে উন্মত্ত সাগর এর থেকে আমাদের উঠে আসতে হবে, দাঁড়াতে হবে এসে তোমার শান্তিপূর্ণ তীরের প্রসন্নতার মাঝে।"[৮০]

আমরা এই বিক্ষুব্ধ সাগর থেকে উঠে আসবো—কিন্তু কেমন করে? কলরবকে নীরবতা দিয়ে, বিক্ষোভকে স্থৈর্য্য দিয়ে, নৈরাশ্যপূর্ণ ব্যাথাকে প্রসন্ন আনন্দ দিয়ে বাধা দিতে হবে; শুরু হবে ব্যষ্টিগত জীবন থেকে, ক্রমে অনিবার্য্য স্রোতে সমষ্টিকে তা অনুসরণ করতে হবে। সংস্কারসাধন, রূপান্তর অন্তরেই শুরু হবে প্রথমে: "নিজেরই মধ্যে সকল বাধা, নিজেরই মধ্যে সকল বিঘ্ন, নিজেরই মধ্যে সকল আঁধার ও অজ্ঞান।"[৮১] তাই নিরাময়ও আসবে অন্তর থেকে। এবং এ গুপ্ত রহস্য সমাধানের সূত্র হ'ল "অন্তরের এক অপ্রস্ফুটিত ও অবগুণ্ঠিত কুসুমকলি। একটিবার যদি মানব মন চিরন্তনের দিকে দৃষ্টি ফেরায় তাহ'লে ত্বরিত ও ক্রমান্বয়ে ধারাবাহিক উপলব্ধির মধ্য দিয়ে ফুলটি একটি করে খুলে দেবে তার সকল

৮০। Prayers and Meditations p. 58

৮১। Prayers and Meditations p. 65

দল।"[৮২] অবশেষে যখন এরূপ এক চূড়ান্ত পর্য্যায়ে মন ফেরে তখন কেবলমাত্র সেই অচল নৈঃশব্দ্য, যা "ব্যর্থ কোলাহল, নিরর্থক বিক্ষোভ, শক্তির বৃথা ক্ষয়"কে[৮৩] গ্রাস করে ফেলে, কেবল তারই বাণী শুনবার সে ক্ষমতা অনুশীলন করতে হবে। এই চিরন্তনীর বাণী—এই নিয়ত নৈঃশব্দ্য—সবই অন্তরের অন্তরে বাহিত হয়, কিন্তু প্রত্যেকেই এই আন্তরশক্তি সম্বন্ধে সজাগ নয় এবং এ ছাড়াও "নীরবতা ক্রমে আরো গাঢ় হয়ে চলেছে ; তোমার সঙ্গে আমাদের ঐক্য যতই পূর্ণ হোক না, যতদিন না আমরা শরীরের দিক দিয়ে অপূর্ণ জগতের অঙ্গীভূত, ততদিন তোমার সঙ্গে আমাদের ঐক্য চিরকালই সুষ্ঠু হতে সুষ্ঠুতর করে ধরা যেতে পারে।"[৮৪] মানবজাতিকে পূর্ণ করতে সক্ষম হবার পূর্ব্বে শ্রীমা নিজেকেই পূর্ণ করে তুলবেন ; এ কারণেই শ্রীমার প্রার্থনা তীব্রভাবে বারংবার পুনরুচ্চারিত হয়, "হে ভগবান, আকুল কণ্ঠে তোমায় আমি ডাকি : আমাকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড করে তোল, যাতে সকল বেদনা পুড়ে যায়··· আমায় রূপান্তরিত কর শুদ্ধ প্রেমের, অপার করুণার দীপ্ত অগ্নিকুণ্ডে।"[৮৫] ভগবান যিনি অবশেষে এখানে প্রমূর্ত্ত, তিনিই "বেদনাময় দ্বন্দ্বসঙ্কুল জগৎকে সমগ্রভাবে তুলতে পারেন সম্মিলনের ও শান্তির জগৎ করে"।[৮৫]

৮২। Sri Aurobindo-Synthesis of Yoga-Part I, p. 1

৮৩। Prayers and Meditations p. 33

৮৪। Prayers and Meditations pp. 39-40

৮৫। Prayers and Meditations p. 48

তখন শ্রীমা যে শুধু দুর্ব্বোধ্য জগতের গুরুভার সম্বন্ধে তীক্ষ্ণভাবে সজাগ ছিলেন তা নয়, এমন কি তাঁর নিজের অদৃষ্ট সম্বন্ধে ও জগতের ভার লাঘব ও সমূলে উৎপাটিত করার যে প্রধান প্রয়োজনীয়তা তার সম্বন্ধেও সচেতন। যদি শ্রীমা দুঃখের মানুষী বিগ্রহের সাথে পৃথিবীর অতিকায় যাতনার অংশ গ্রহণ করেন, তাহ'লে তিনি কোনো অংশে তাঁর অযোগ্য 'দিব্যদ্রষ্টা সহকর্ম্মিণী' হবেন না, এবং জীবন জ্যোতি ও প্রেমকে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা করবেন। এই স্মরণীয় অংশ থেকেই অনুমান করা যায় যে শ্রীমা ঐ দ্বৈতগতির জন্যই জীবন উৎসর্গ করেছেন।

"আমার মনে হয় দিনে ও রাত্রে অনেকবার আমি—অর্থাৎ আমার সমস্তখানি চেতনা, আমার হৃদয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছে, হৃদয় যেন আর বাহ্য দেহযন্ত্র মাত্র নয়, এমন কি কোন ভাব-প্রবণতাও নয়—সে হয়েছে দিব্যপ্রেম, নৈর্ব্যক্তিক, শাশ্বত। এই পরম প্রেমে পরিণত হয়ে গিয়ে আমি অনুভব করি সমগ্র পৃথিবীর সর্ব্ববস্তুর হৃৎকেন্দ্রে আমিই ত রয়েছি, তখনই আমার মনে হয় যেন আমার বিস্তৃত বাহুদুটি নিরন্তর প্রসারিত হয়ে চলেছে, বিশ্ব হতে বিশালতর আমার বক্ষের মধ্যে সকল জীবকে সংহত, শ্রেণীবদ্ধ, নিমজ্জিত করে অসীম স্নেহে ঘিরে রেখেছে···বাক্য দুর্ব্বল ও অক্ষম।"[৮৭]

সত্যই এরূপ অলৌকিক দর্শন, এরূপ ইঙ্গিত ও জাগ্রত সত্যকে নিছক কথার ভাষায় ধরার চেষ্টা নিরর্থক—

৮৬। Prayers and Meditations p. 51

৮৭। Prayers and Meditations p. 62

"হায় বৃথাই অশক্ত কথা, দুর্বল পক্ষ, বৃথা তার চেষ্টা,
বৃথাই চেষ্টা এমন স্বর্গীয় দৃশ্যের বর্ণনা দিতে।"[৮৮]

দ্বন্দ্বমত ও আপেক্ষিক পৃথিবী একদিন না একদিন চলে যাবে,—যাচ্ছেও ; কুয়াসা যতই অপসৃত হবে ততই অনবধারণীয় অভিনব দীপ্তি বিকশিত হয়ে উঠবে ও ঐ শাশ্বত শক্তি ও অভিনব সান্নিধ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে মর্ত্ত্য "অবশেষে হৃদয়ঙ্গম করবে তার সত্যকার লক্ষ্য সব কি, তোমাকে পূর্ণভাবে লাভ করে জীবনে শান্তি ও সুসঙ্গতি ফুটিয়ে ধরে "[৮৯]

তেরো

১৯১৪ সালের ৩রা মার্চ শ্রীমা লিখলেন, "আমার যাত্রার দিন যত নিকটে আসছে তত আমি একটা শান্ত সমাহিত চেতনার মধ্যে প্রবেশ করছি।"[৯০] তিনি শীঘ্রই এক দীর্ঘ জলযাত্রা করবেন— "তোমার সান্নিধ্যে অভিষিক্ত এই নিস্তব্ধ ঘরখানিতে এই টেবিলে বসে লিখতে আর পারব না।"[৯১] এবং তাই যে সব 'তুচ্ছ জিনিস' শ্রীমাকে ঘিরে রেখেছে সহৃদয় প্রীতি নিয়ে তাদের দিকে তিনি দৃষ্টি ফেরান এবং বাহির থেকে তাঁকে যে আনন্দ তারা দিয়েছে তার জন্য তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আর ভবিষ্যতের সমচিত্ততা নিয়ে সম্মুখীন হন—

৮৮। Giles Fletcher

৮৯। Prayers and Meditations p. 38

৯০। Prayers and Meditations p. 65

৯১। Prayers and Meditations p. 67

—"আমার একমাত্র ইচ্ছা এ যেন হয় একটা নূতন আন্তর যুগের আরম্ভ"।[৯২] তিনদিন পরেও যখন জেনেভা সহরে শ্রীমা তখনও এক বিচ্ছেদের যাতনা ভোগ করলেন এবং বিভ্রান্ত হলেন এই ভেবে যে এই ভাবাবেগ বালসুলভ কিনা। কোনো কোনো দিক থেকে তা সত্যই; কিন্তু তবুও তিনি জিজ্ঞাসা করেন: "এই আসক্তি, এই ব্যক্তিগত স্নেহ মানুষের একটা অজ্ঞানতঃ চেষ্টা নয় কি যাতে সে ব্যষ্টতঃ যতদূর সম্ভব উপলব্ধি করতে পারে সেই মূল একত্ব যার দিকে সে কিছুমাত্র না জেনেই ক্রমাগত চলেছে।"[৯৩]

"কাগামারু" জাহাজে এক অনির্ব্বচনীয় সাচ্ছন্দ্যের ভাব, ইষ্টদেবতার সচেতন আবির্ভাব ও অভয়রূপের পরিবেশ ছিল; শ্রীমার আস্পৃহাপূর্ণ প্রার্থনা এখনও পূর্ব্বেরই মত তাঁরই উদ্দেশ্যে উঠে চলেছে,"তোমার প্রেমকে জীবনে ফলিত করবে, চারদিকে ছড়িয়ে দেবে এত প্রবলবেগে এত সাফল্যের সঙ্গে, যে যারাই আমাদের সংস্পর্শে আসবে তারা সকলেই পাবে বলবীর্য্য, নবজীবন, জ্ঞানের আলো। শক্তি চাই—জীবনকে নিরাময় করবার জন্যে, দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তি লাভের জন্যে, শান্তি আর অটল বিশ্বাস গড়বার জন্যে, মনস্তাপ মুছে ফেলে তার স্থানে সেই একমাত্র সত্যকার সুখ স্থাপন করবার জন্যে যা রয়েছে তোমার মধ্যে, যার নাই নির্ব্বাণ···।"[৯৪] পরদিন

৯২। Prayers and Meditations p. 67

৯৩। Prayers and Meditations p. 68

৯৪। Prayers and Meditations pp. 69-70

প্রত্যূষে—৮ই মার্চ ১৯১৪ তারিখে—শ্রীমার কাছে মনে হল যেন তিনি বোধ হয় "জাহাজের সকল যাত্রীকে গ্রহণ করেছেন, সমান ভালবাসা দিয়ে তাদের ঘিরে রেখেছেন।"[৯৫] শ্রীমার অস্বাচ্ছন্দ্য ভাব আর নেই—তিনি জাহাজটির মধ্যে সম্পূর্ণ নিজের বাসস্থানেরই স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করলেন যা তাঁর কাছে মনে হ'ল এ যেন "অপূর্ব্ব শান্তির ধাম, পুণ্যমন্দির তোমারি পূজায় সে যেন চলেছে।"[৯৬] তারপর দুদিন পরে এক মহান উপলব্ধি তিনি পেয়েছিলেন এবং এই উপলব্ধি অপূর্ব্বসুন্দর ও অনুপ্রাণিত ভাষায় তিনি সংক্ষেপে লিখলেন:

"রাত্রির নীরবতায় তোমার শান্তি সর্ব্বত্র বিরাজ করে, আমার হৃদয়ের নীরবতার মধ্যেও তোমার শান্তি সর্ব্বদা বিরাজ করে। আর যখন এই দুটি নীরবতা এক হয়, তখন তোমার শান্তি এত শক্তিমান হয়ে ওঠে যে কোন বিপদই আর বাধা দিতে পারে না। এমন সময়ে আমার মনে হল তাদের কথা যারা জাহাজের উপর জেগে পাহারা দেয় পথ নির্ব্বিঘ্ন রাখবার জন্যে, হৃদয় আমার কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল, আমি কামনা করলাম যাতে তাদের অন্তরে শান্তি নেমে আসে, পায় স্থায়ী প্রতিষ্ঠা। তারপর মনে হল তাদের সকলের কথা যারা একান্ত আত্মবিশ্বাসী ভাবনাহীন নিশ্চেতনার ঘুমে নিমগ্ন, তাদের দুঃখে দৈন্যের জন্য চিন্তিত হয়ে তাদের যে প্রসুপ্ত দুঃখ

৯৫। Prayers and Meditations p. 70

৯৬। Prayers and Meditations p. 71

কষ্ট জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠবে সেজন্যে করুণার্দ্রচিত্তে আমি কামনা করলাম যাতে তাদের হৃদয়ে তোমার শান্তির একটুখানি অন্তত স্থান পায়, আধ্যাত্মিক জীবন যেন তাদের মধ্যে ফুটে ওঠে, আলো এসে দূর করে যেন অজ্ঞান অন্ধকার। তারপর আমার মনে হল সেই জীবের কথা যারা এই বিপুল সাগরের বুকে বাস করে, কামনা করলাম যাতে তাদেরও উপর প্রসারিত হয় তোমার শান্তি। আমার মনে হল তারপর তাদের কথা যাদের ফেলে এসেছি বহু-দূরে, যাদের প্রীতি এখনও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে, গভীর স্নেহভরে তাদের জন্যে প্রার্থনা করলাম যাতে তারা পায় তোমার সচেতন ও স্থায়ী শান্তি, তোমার শান্তির পরি-পূর্ণতা, তাদের গ্রহণসামর্থ্যের অনুপাতে। তারপর আমার মনে হল তাদের কথা যাদের কাছে আমরা চলেছি, যারা বাল-সুলভ কাজকর্ম নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, যারা অজ্ঞানের অহংকারের বশে, হীন স্বার্থের জন্য লড়াই করে চলে; তাদের হয়ে, তীব্র-ভাবে বিপুল আস্পৃহা নিয়ে প্রার্থনা করলাম যাতে তারাও লাভ করে তোমার শান্তির পরিপূর্ণ জ্যোতি। তারপর আরো আমি চিন্তা করলাম তাদের কথা যাদের আমি চিনি, যাদের আমি চিনিনা; যে অখণ্ড জীবনধারা পরিস্ফূর্ত হয়ে চলেছে, যা-কিছু রূপের পরিবর্তন করেছে, যা রূপ গ্রহণ করেনি এখনো, এ সকলের কথা, আরো তাদের কথা যাদের আমি চিন্তায় আনতে পারিনি, আবার যা-কিছু আমার স্মৃতির মধ্যে জাগ্রত রয়েছে, আর যা-কিছু বিস্মৃত হয়েছি—এদের সকলের

জন্যে গভীর সমাহিত চিত্তে, নীরব আরাধনায় তোমার শান্তি আমি ভিক্ষা করলাম।"[৯৭]

শান্তি···শান্তি···আর শান্তি—এ এক "রহস্যময় প্রীতি-বাক্য" বারংবার স্নেহাদরের মত যাদুমন্ত্রের মত পুনরাবৃত্ত হয়। হপকিন্‌স্ বলেন, "খণ্ড শান্তি হল নগণ্য শান্তি" এবং সেইজন্য অতীতের দান হিসাবে প্রাপ্ত পৃথিবীর অশুভ, অপবিত্রতা ও আর্ত্তির যে বিরাট সমস্যা তা হৃদয়ঙ্গম ও সমাধান করতে পারে একমাত্র চিরস্থায়ী শান্তি। "দিব্যদ্রষ্টা সহধর্ম্মী" শ্রীমা যে শান্তির কামনা করেন তা একদিন আসবেই এবং এই অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলার শক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করবেই।

সেই "নীরব ও নির্ম্মল সব রাত্রি" চলতে লাগল, তখনও আনন্দানুভূতিও স্থায়ীভাবে থাকল অটুট, এক নামহীন শক্তি হল তাঁর প্রাণ এবং তাঁকে ঘিরে ধরল এক নীরব তেজ যা আবার তাঁর প্রতিটি গতিকে যেন নব আলোয় উদ্দীপিত করে তুলল। নীরব স্তুতির মত, মৌন আরাধনার মত, শ্রীমার অভীপ্সা উঠে চলে তাঁর দিকে এবং শ্রীমার হৃদয় উদ্ভাসিত করবার জন্য তাঁর দিব্য প্রেমকে ডেকে আনেন। সত্যই তিনি যেন এক অনুপম যাদুকর "যিনি সব জিনিস রূপান্তরিত করেন, কদর্য্য হতে তুলে ধরেন সৌন্দর্য্য, অন্ধকার হতে আলো, পঙ্ক হতে নির্ম্মল জল, অজ্ঞান থেকে জ্ঞান, অহংকার থেকে মৈত্রী।"[৯৮] এই যাদুকর কর্ম্মীর কাছে শ্রীমা খুসী হয়েই

৯৭। Prayers and Meditations p. 71-73

৯৮। Prayers and Meditations p. 80

আনত হলেন এবং দিব্য রূপান্তরের যত সূক্ষ্ম যন্ত্র, তাদের সঞ্চালন করতে শিক্ষা করলেন। আধুনিক বিজ্ঞানের অনুপমতার কোনো তুলনাই হয় না এই "পরাবিদ্যা"র সাথে যা শুধু হ'ল "তোমার সঙ্গে একীভূত হওয়া, তোমারই উপর নির্ভর রাখা, তোমার মধ্যে বাস করা, তুমিই হয়ে যাওয়া—তখন আর অসম্ভব বলে কিছু থাকে না, কারণ সে-মানুষ তখন প্রকাশ করে তোমার সর্ব্বশক্তিমত্তা।"[৯৯] ভগবানের সঙ্গে এরূপ পূর্ণ একত্ব সহজসাধ্য মোটেই নয়। এ পথ দীর্ঘ—সুদীর্ঘ। কিন্তু শ্রীমা লিখলেন "এই হল একটা জিনিস যা আমি আশা করেছি ভারতে এসে আমার লাভ হবে।"[১০০]

ফরাসী ভারতের পণ্ডিচেরীই ছিল শ্রীমার গন্তব্য-স্থান এবং ২৯শে মার্চ ১৯১৪ সালে মঁসিয় পল রিশারের সঙ্গে তিনি এখানে উপস্থিত হলেন। শ্রীমা তাঁর জলযাত্রার সময়ে প্রতি-ক্ষণেই উপলব্ধি করলেন ঈশ্বরের "দিব্য হস্তের পরিচালনা", আর তিনি দেখলেন তাঁর বিধান প্রকাশ হয়ে চলেছে সর্ব্বত্রই[১০১] এবং তাঁর দিব্য-বিধানের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করতে ও তাকে বিনাশ্রমে ও যুগপৎভাবে প্রকাশ করতে সচেষ্ট হলেন। এখানে এই পণ্ডিচেরীতে কি সম্ভাবনা নিহিত, কি এক বিরাট দিগন্ত তাঁর সম্মুখে প্রসারিত। তাঁর অপ্রতিম

৯৯। Prayers and Meditations p. 78

১০০। Prayers and Meditations p. 85

১০১। Prayers and Meditations p. 87

সান্নিধ্যের পূর্ণ চেতনার মধ্যে শ্রীমা তাঁর অবিচল দৃষ্টি ও নির্ব্বিচল বিশ্বাস নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে মুখ ফেরালেন।

চৌদ্দ

পণ্ডিচেরীতে পৌঁছানর কয়েকদিন পরেই শ্রীমা ১৯১৪ সালের ৩০শে মার্চ লিখলেন—

"শত শত জীব যদিও বা গাঢ়তম অজ্ঞানতার মাঝে নিমজ্জিত হ'য়ে থাকে, তাতেও যায় আসে না কিছুই। কাল যাঁকে আমরা দেখেছি তিনি পৃথিবীতেই বর্ত্তমান; তাঁর উপস্থিতিই যথেষ্ট প্রমাণ যে এমন একদিন আসবেই যেদিন আঁধার আলোকে পর্য্যবসিত হবে, যেদিন তাঁরই দিব্যজগৎ সত্যসত্যই স্থাপিত হবে এই মর্ত্ত্যে।

হে প্রভু, তুমিই এই অভূতপূর্ব্বতার দিব্য স্রষ্টা, আমার হৃদয় আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় পরিপ্লুত হয়ে যায় যখনই চিন্তা করি এ কথা, আর আমার আশা হয়ে উঠে সীমাহীন।"[১০২]

এই যে "অভূতপূর্ব্ব" "যাঁকে আমরা গতকাল দেখেছি", তিনি শ্রীঅরবিন্দ। প্রায় পুরো দুইটি বছরের অসাধারণ নিরবচ্ছিন্ন রাজনৈতিক জীবনের পর—আবার যাঁর মাঝে পুরো একটি বছর আলিপুর জেলে অতিবাহিত হয়েছিল—শ্রীঅরবিন্দ ১৯১০ সালের ৪ঠা এপ্রিল পণ্ডিচেরীতে এসে পৌঁছলেন এবং যোগসাধনায় পূর্ণ আত্মনিয়োগ করলেন। এই চারটি বছরের মধ্যেই তিনি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়ে-

১০২। Prayers ahd Meditations pp. 88-89

ছিলেন অধ্যাত্ম-সাধনার এক নূতনতর পথ—পূর্ণযোগের পথ। এ যোগ জড় ও আত্মার দুটি বিভিন্ন অভিজ্ঞতাকে ও অতীতের জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সুবর্ণ-পথকে মিলিয়ে সমন্বয়ের মধ্যে আনা এবং তাদের সুসংবদ্ধ ও অতিক্রম করে যাওয়া। শ্রীমার মত ম'সিয় রিশারও এই নবমানবের "অভূতপূর্ব্বতা"কে—এই জ্যোতির্ম্ময় প্রমূর্ত সত্যকে দেখে বিহ্বল হয়েছিলেন এবং পরে এক জাপানী জনমণ্ডলীর সামনে ঘোষণা করেছিলেন—"এক বৃহৎ জিনিস, এক মহৎ ঘটনা, মহাপুরুষদের—এশিয়ার দিব্যমানবের—আবির্ভাবকাল আগতপ্রায়। চিরজীবন আমি এঁদের অনুসন্ধানেই সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছি, কারণ আমার জীবনে এই কথাটি আমি চিরকাল অনুভব করে এসেছি যে, এ পৃথিবীর কোন এক স্থানে এঁরা আছেনই এবং এও অনুভব করেছি আমি যে, এঁরা কোথাও না থাকলে এ পৃথিবী মৃতকল্প হয়ে দাঁড়াতো। কারণ এঁরাই হলেন এ বিশ্বের আলো, উত্তাপ ও প্রাণ। এই এশিয়ার বুকে দেখেছি আমি পুরুষোত্তমকে—যিনি হলেন দিশারী, আগামীকালের নেতা, তিনি ভারতীয়, তাঁর নাম অরবিন্দ ঘোষ।"

শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার এই যে সাক্ষাৎ তা হ'ল উভয়েরই এক নব ব্রত উদ্‌যাপন; আর, অন্য এক অর্থে একে বলা যায় পূর্ব্বনির্দ্ধারিত আধ্যাত্মিক "ওডেসি"র নব পর্য্যায়। আত্মসিদ্ধির পর শ্রীঅরবিন্দ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন—যে কথা তিনি তাঁর শিষ্য দিলীপকুমার রায়ের কাছে পরে প্রকাশ করেন—যে একক ব্যক্তিগত রূপান্তরই সব নয়, সমগ্র মানবজাতিকে আত্ম-

উপলব্ধির পথে পূর্ণতা লাভ করতেই হবে। কোন আধুনিক বিশ্বামিত্রও তাঁর ঔদ্ধত্যপূর্ণ যৌগিক যাদুদণ্ডের সংযোগে প্রচেষ্টা করবেন না সম্পূর্ণ নূতন জগৎ সৃষ্টি করতে। বাস্তবিক শ্রীঅরবিন্দের অম্লান আদর্শ ছিল বিপুল যোগপ্রয়াসের দ্বারা এখানে এখনই এক আত্ম-সমাহিত ও শক্তিশালী নূতন জগৎ, নূতন স্বর্গ, নূতন মর্ত্ত্য সৃষ্টি করা। কিন্তু এরূপ জগৎ এক মুহূর্ত্তে কারও হুকুমে সৃষ্টি করা যায় না। এর পথ দীর্ঘ, প্রক্রিয়াও দুঃসাধ্য; কিন্তু পথের শেষে আছে সেই নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য; এবং অধ্যাত্ম-জীবন-প্রত্যাশীর কাছে এই যথেষ্ট। শ্রীমাও তাঁর নবপ্রাপ্ত শান্তি ও অপার আনন্দের মধ্য দিয়ে অনুভব করেছিলেন হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে—"আমার অন্তরের গড়ারূপ মিথ্যা স্বপ্নের মত বিলীন হয়ে গেছে—এক নূতন পর্য্যায়ের হয়েছে শুরু।"[১০৩] শ্রীমা দু'দিন পরেই লিখলেন আবার যে "আমার মনে হয় কোন সময়ে যা ছিল আমার কাছে এক পরিণাম, এখন তা হয়েছে এক প্রস্তুতিমাত্র।"[১০৪] দিন চলে যায়; দিন আবার আসে। আমার আরম্ভেই আমার শেষ; আমার এই শেষেই আমার আরম্ভ। অতীত তো মৃত নয়, বরং নূতনের সাজ পরেছে সে। তাই শ্রীমা বলেছেন—"যে নূতন ধারা আমাদের সামনে জেগে উঠেছে তা হ'ল সম্প্রসারণের, কিন্তু সংযমনের নয়।"[১০৫] কর্ম্মের

১০৩। Prayers and Meditations p. 89

১০৪। Prayers and Meditations p. 90

১০৫। Prayers and Meditations p. 89

প্রণালী পরিবর্ত্তিত হয়, উপায়ও হয় কখনও বিচিত্র ধরণের, কিন্তু লক্ষ্য পূর্ব্ববৎ স্থির। মানবের দেবত্ব, প্রকৃতির রূপান্তরই হ'ল মৌলিক উদ্দেশ্য এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বহি-জগতের পানে দৃষ্টি ফেরাবার পূর্ব্বে তাঁকে প্রথম পূর্ণ-নিটোল করে তুলতে হবে আন্তর শক্তিটি। সেই পরমেশ্বরের কাছে অখণ্ড ও পূর্ণ সমর্পণই হবে উপায়, যা প্রবেগ ও কর্ম্মের, অন্তঃসার ও অবরোহণের সাথে সংযোগ এনে দেবে। এভাবেই শেষে পূর্ণ আত্মসমর্পণের মধ্যে ডুবে যাওয়া সব বাধা ভেঙ্গে মিলিয়ে যাওয়া, অন্তিম প্রতিবন্ধক বিদীর্ণ করে ভাসিয়ে দেওয়া। তারপর, শুধু এক অপার, নিরবচ্ছিন্ন পরমানন্দ:

"মনে হয় আমার নেই কোন সীমা, শরীরের বোধ পর্যন্ত আর নেই ; নেই কোন সংবেদন, নেই কোন অনুভূতি কোন চিন্তা···আছে শুধু নির্ম্মল বিশুদ্ধ প্রশান্ত বিশালতা, আলোকে ও প্রেমে অনুস্যূত, অনির্ব্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ—এ ছাড়া আমি যেন আর কিছুই নই··· ।"[১০৬]

এ যেন সিয়েনার সেণ্ট ক্যাথরিন-এর এক ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের কল্পনার প্রতিচ্ছবি:

"দেহ ফেলে হারিয়ে তার সব অনুভূতি, পশ্যন্তি চক্ষু দেখেও দেখে না, শৃণ্বন্তি কর্ণ শুনেও শোনে না, জিহ্বা উচ্চারণ করে না বাক্।" যেমন মোম অগ্নিতে, বরফ স্রোতের মাঝে, সুগন্ধ সমীরণের মাঝে বিলীন হয়ে যায়, তেমনি ভেদভাবও

১০৬। Prayers and Meditations p. 95

নাস্তি হয়ে যায় এবং কেবল থেকে যায় সেখানে অপরিসীম আনন্দ। রূপান্তর তখন পূর্ণ চরম :

"ভগবান, তুমি আমার জীবন গ্রহণ করেছ, তোমার নিজের করে নিয়েছ ; তুমি আমার ইচ্ছাকে গ্রহণ করেছ, তোমার ইচ্ছার সাথে মিলিয়ে ধরেছ ; তুমি আমার প্রেমকে গ্রহণ করেছ, তোমার প্রেমের সাথে এক করে নিয়েছ ; তুমি আমার চিন্তাকে গ্রহণ করেছ, তার পরিবর্তে স্থাপন করেছ পূর্ণ চেতনা।"[১০৭]

এই পূর্ণ নিঃসন্দিগ্ধতার শক্তির মাঝে এই প্রশান্ত নির্ম্মলতার সৌন্দর্যের মাঝে শ্রীমা নূতনভাবে নিজেকে উৎসর্গ করলেন পৃথিবীর বিপুল যন্ত্রণাকে উপশম করার ব্রত গ্রহণে ও তাকে তার পরম দেবত্বে তুলে ধরতে ; তাই শ্রীমা প্রার্থনা জানালেন : "হে প্রভু, তোমার উপর আমার আস্থা রয়েছে, তুমিই জান তোমার যন্ত্রকে কিরূপে পরিচালিত করতে হয়, পরিপুষ্ট করতে হয়।"[১০৮]

পনর

১৯১৪ সালে মে মাসের গোড়ার দিকে শ্রীমার স্বাস্থ্য ভগ্ন হল "এবং কয়েকদিন ধরে শরীরে কোন শক্তি ছিল না"।[১০৯] এ যেন ইঙ্গিতে বলছে তাঁর কাছে যে "আমার আধ্যাত্মিক

১০৭। Prayers and Meditations p. 95

১০৮। Prayers and Meditations p. 102

১০৯। Prayers and Meditations p. 105

বল হ্রাস পেয়েছে, সর্ব্বশক্তিময় একত্বের দৃষ্টি আমার মলিন হয়েছে···।" ১১০ মায়ের আলাপ বইটিতে সবিস্তারিতভাবে এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছে—

"কোথায় যোগের আরম্ভ, আর কোথায় তার শেষ? তোমার সমগ্র জীবনটাই কি যোগ নয়? ব্যাধির সম্ভাবনা সর্ব্বদাই রয়েছে তোমার দেহের মধ্যে এবং তোমার চতুর্দিকে। তোমার শরীরের ভিতরে তুমি সদাই নানা রোগের বীজাণু বয়ে বেড়াচ্ছ, তোমার চারিপাশে তারা দলে দলে সব সময়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তা হলে এমন কেন হয় যে বহু বৎসর ধরে তুমি বেশ আছ আর হঠাৎ একটা রোগ তোমাকে পেড়ে ফেললে? তুমি বলবে যে তার কারণ প্রাণশক্তির দুর্ব্বলতা। কিন্তু এ দুর্ব্বলতাই বা হঠাৎ এল কোথা থেকে? এল তোমার সত্তার মধ্যের কোন অসমতা অসঙ্গতির থেকে, এল তুমি দিব্যশক্তিচয়কে গ্রহণ করতে পার নাই বলে। যখন তুমি এই শক্তির ও দীপ্তির আশ্রয় হ'তে নিজেকে বঞ্চিত কর, তখন তোমার প্রাণশক্তি ক্ষীণ হয়, ডাক্তারী ভাষায় রোগের অনুকূল ক্ষেত্র তৈরী হয়, সেই সুযোগ পেয়ে বিরুদ্ধ শক্তিগুলো এসে হানা দেয়। সংশয়, ভরসার অভাব, বিশ্বাসের অভাব, কেবল নিজের অহমিকার দিকেই তাকিয়ে থাকা, এই সবই তোমাকে বঞ্চিত করে ভাগবত শক্তি ও দীপ্তির আশ্রয়ের থেকে, আর শত্রুর আক্রমণকে সহজ করে দেয়।"১১১

১১০। Prayers and Meditations p. 105

১১১। Words of the Mother pp. 117-118

শ্রীমা হলেন অক্ষয়, অজর অসীম-স্বরূপিণী মা, যিনি সাধারণ মানসিক গঠনভঙ্গির দৃষ্টিতে সুখ ও দুঃখের অতীত, সুস্থতা ও অসুস্থতার অতীত, বিশ্বাস ও দ্বিধার অতীত ; তবুও তিনি মানবমাতার পরাকাষ্ঠা, 'দুঃখের মানুষী বিগ্রহের' সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন, যা-ই সাক্ষাৎ করেন তারই অংশ তিনি, সকল আনন্দ ও সকল আর্ত্তির সমভাগী ; তাই তাঁর ধ্যান ও প্রার্থনার স্বর নানা ব্যঞ্জনায় ঝঙ্কৃত, কখনো পূর্ণপরিণতির প্রশস্তি-স্তোত্রে গাঁথা, কখনও আবার অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানবের ক্ষয়িষ্ণু বিফলতা ও ব্যর্থ প্রয়াসে অনুচ্চকণ্ঠে ছন্দিত বর্ণিত।

১৯১৪ সালের ১২ই মে তারিখ দিয়ে শ্রীমা লিপিবদ্ধ করলেন আর এক অভিনব অভিজ্ঞতা—

"আজ সকালে আমার অভিজ্ঞতা হল : আমি দ্রুত চলে গেলাম গভীর হতে গভীরে, তারপর যেমন সচরাচর আমার হয়ে থাকে, তোমার চেতনার সঙ্গে আমার চেতনা সংযুক্ত হয়ে গেল, তোমারই মধ্যে রয়ে গেলাম, অর্থাৎ এক তুমিই রয়ে গেলে—কিন্তু তোমার ইচ্ছাবল আমার চেতনাকে বাহিরের দিকে টেনে আনলে, যে কর্ম্ম উদ্‌যাপন করতে হবে তার দিকে, আর তুমি আমায় বললে : 'যে যন্ত্রের আমার প্রয়োজন তোমাকে তাই হতে হবে।' এ কি তবে সেই অন্তিম ত্যাগ নয়, তোমার সঙ্গে একত্বের ত্যাগ…।"[১১২]

বুদ্ধ যখন বোধিসত্ত্ব হলেন তখন কি স্ব-ইচ্ছায় নির্বাণকে ত্যাগ করেননি যা'তে তিনি এই সন্তপ্ত মর্ত্তে আবার প্রত্যাবর্ত্তন

১১২। Prayers end Meditations p. 108

করতে পারেন ও আপন মানুষজনের আত্মাকে পুনরুদ্ধার করতে পারেন। অভয়ংকর বুদ্ধের মত শ্রীমা-ও তাঁর চরম ও পরম ত্যাগের দ্বারা দেখালেন "সেই সৃষ্ট ও অপূর্ণ আত্মার দিকে সৃজনক্ষম পূর্ণ আত্মার সমগ্রগতি, সেই স্থানমুক্ত ভগবানের স্থান ও কালের মাঝে স্বেচ্ছায় আত্ম-প্রকাশকে।"[১১৩] স্বনির্ব্বাচিত আত্মসম্পুটনের দ্বারা "তোমার একত্ব আর প্রকটিত জগতের মাঝখানে যে অন্তর্ব্বর্ত্তী লোক"[১১৪] সেখানে অধিষ্ঠিত হয়ে উভয়ের মধ্যস্থ ব্যবধানটি শ্রীমা আরো মুছে দেবেন, ঈশ্বরের আনন্ত্যকে বস্তুজগতে টেনে আনবেন এবং তাকে তুলে ধরবেন তাঁর সক্রিয় তেজরশ্মিকে গ্রহণ করবার জন্যে। প্রার্থিত সন্ন্যাস সহজেই অনুমোদন করা হয়েছিল কেননা শ্রীমা ঈশ্বরের এই প্রেমদীপ্ত ভরসা পেয়েছিলেন: ("একদিন তুমি হবে আমার শিরোদেশ, এখন তুমি দৃষ্টি দাও পৃথিবীর দিকে)"[১১৫]

এখন আর মানসিক বিক্ষোভ বা সংশয়ের কোন স্থান নেই চরম লক্ষ্য বা তাতে পৌঁছানোর উপায় নির্দ্ধারণে, এ সম্বন্ধে কোন দ্ব্যর্থই নেই আর। এইভাবে শ্রীমা ১৬ই মে, ১৯১৪ সালে লিখলেন—

"এখন আমি স্পষ্টই বুঝতে পারি যে তোমার সঙ্গে একাত্মতা দূরের লক্ষ্য নয় যার দিকে ক্রমে এগিয়ে যেতে

১১৩। Underhill "Man and the Supernatural" p. 143

১১৪। Prayers and Meditations p. 110

১১৫। Prayers and Meditations p. 113

হবে—অন্ততঃ বর্ত্তমানের এই ব্যক্তিসত্তাটির পক্ষে নয়—কারণ, বহুদিন হতেই সে সিদ্ধি তার লাভ হয়েছে। তাই ত তুমি যেন সর্ব্বদা আমায় বলছ: 'এই একাত্মতার ভাবাবেশে বিভোর হয়ে যেও না; পৃথিবীতে যে ব্রতের ভার তোমার উপর দিয়েছি তাই তুমি পূর্ণ কর।'...সকলের কাছে বুঝিয়ে বলতে হবে আগে দরকার একত্ব, তারপর কর্ম্ম। কিন্তু যাদের একাত্মতা অধিগত হয়েছে তাদের দেখতে হবে জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত যেন হয় তাদের তোমার ইচ্ছার অখণ্ড প্রকাশ।"[১১৬]

একমাস না যেতেই শ্রীমা আবার লিখলেন...

"প্রথমে জয় করতে হবে জ্ঞান অর্থাৎ শিক্ষা করতে হবে কি রকমে তোমাকে জানা যায়, তোমার সঙ্গে এক হওয়া যায়। এ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যে সব-রকম উপায়ই উৎকৃষ্ট, সবকেই কাজে লাগান যেতে পারে।...তোমাকে জানা চাই, প্রথমে ও সকলের আগে—সত্য কথা। কিন্তু তোমাকে জানবার পর বাকী রয়ে গেল তবু তোমার প্রকাশের সব কাজটাই—আর তখনই দেখা দেয় এই প্রকাশের গুণ, শক্তি, জটিলতা, পরিপূর্ণতার কথা সব।"[১১৭]

মানুষকে দিব্যে পরিণত করা, ব্যবহারিক জীবনকে রূপান্তরিত করা, এ হ'ল সত্যই এক "বিরাট" কর্ম্মসূচী। এর কল্পনাই শ্রীমার সমগ্র সত্তাকে পুলকিত করে তোলে, আত্ম-

১১৬। Prayers and Meditations pp. 112—113

১১৭। Prayers and Meditations pp. 133-134

সমর্পণের প্রতিষ্ঠা যেন নূতন সুরে উচ্চারিত হয়ে অনির্ব্বাণের অনুদাত্ত স্বরে স্পন্দিত হয় ;

"একটা সত্যকার সৃষ্টির কাজই আমাদের করতে হবে—সৃষ্টি করতে হবে নবতর কর্ম্ম, নবতর জীবন-ধারা, যাতে এই যে মহাশক্তি পৃথিবীতে এ যাবৎ অপরিজ্ঞাত রয়েছে তার প্রকাশ হতে পারে পূর্ণ পরিপূর্ণতা নিয়ে। এই নবজন্ম দানের মহা-প্রয়াসে আমি নিজেকে উৎসর্গ করেছি, হে ভগবান···দিয়েছ তোমার প্রতিশ্রুতি ; এ সব জগতে তাদের তুমি পাঠিয়েছ যারা—বস্তু হোক আর জীব হোক—তোমার প্রতিশ্রুতিকে ফলবান করে তুলতে পারে।···এ কাজ যখন করতে হবে, তখন তা করা হবেই।"[১১৮]

ষোল

ব্যক্তি, বিশ্ব, বিশ্বাতীত ; শ্রীমা কখনও এর এটি, কখনও ওটি, আবার কখনও অন্যটি ; তাই শ্রীমার ধ্যান ও প্রার্থনাও কখনও এ স্তর, আবার কখনও অন্য স্তর থেকে প্রবাহিত হয়। আর, যে করেই হোক, মা যেমন সর্ব্বদা যুগপৎ এই ত্রিপদে অধিষ্ঠিত, তেমনি তাঁর অন্তরাত্মার এই শ্বাস-প্রশ্বাসে তাঁর অন্তরস্থ চিৎশক্তিতে রয়েছে এক বহুত্বের সংযুক্ত সমাহার, এক আশ্চর্য একত্র। যখন তিনি ধ্যান করেন, সমস্ত মানবের প্রতিনিধি হয়েই ধ্যান করেন ; যখন তিনি প্রার্থনা করেন তখন মানবজাতির কল্যাণার্থেই করেন, যাতে মানবের উদ্ধার

১১৮। Prayers and Meditations p. 135

সাধন হয় তারই জন্তে প্রার্থনা করেন তিনি। তাঁর স্বপ্ন ও অলৌকিক দর্শন, তাঁর সজাগ চিন্তা ও সঙ্কল্প, এ সবই প্রয়োজনের তাগিদ, আস্পৃহা ও ক্ষুধিত মানবের আশা আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ—সে ক্ষুধা হল পরিপূর্ণ স্থিতির, পূর্ণ জ্ঞানের ও পরম আনন্দের তরে। ৩১শে মে, ১৯১৪ সালে শ্রীমা তাঁর রূপান্তরের এক অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করলেন, তা হল—

"প্রশান্ত সন্ধ্যার আত্মসমাহিতির মধ্যে সূর্য্য যখন ডুবে গেল, আমার সমগ্র আধার তোমার কাছে প্রণত হল, ভগবান, মৌন পূজা নিয়ে, পূর্ণ সমর্পণ নিয়ে। আমি হয়ে গেলাম সমস্ত পৃথিবী—সমস্ত পৃথিবী তোমার কাছে প্রণত হল, তোমার জ্যোতির আশীর্ব্বাদ, তোমার প্রেমের পরমানন্দ ভিক্ষা করে। পৃথিবী নতজানু হয়ে মিনতি জানায় তোমার কাছে—রাত্রির নীরবতায় অন্তর্ম্মুখ হয়ে যায়, ধৈর্য্য ধরে, সেই সঙ্গেই উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে তার পরম কাম্য জ্যোতির আবির্ভাবের জন্য। জগতের কর্ম্মে অবতীর্ণ তোমার প্রেম হয়ে ওঠার মাধুর্য্য আছে—অনুরূপ মাধুর্য্যই আছে এই অসীম প্রেমের দিকে উর্দ্ধে উঠে চলে যে অসীম আস্পৃহা তা হয়ে ওঠায়। আর এই রকমে নিজেকে পরিবর্ত্তন করে ধরা, পরপর কি প্রায় যুগপৎ হয়ে ওঠা, যে গ্রহণ করে আর যে দান করে, যে রূপান্তরিত হয় আর যে রূপান্তরিত করে, একদিকে বেদনাক্লিষ্ট অন্ধকার, অন্যদিকে সর্ব্বশক্তিময় দিব্যজ্যোতি, দুয়েরই সঙ্গে একাত্মতা এবং এই যুগ্ম একাত্মতার মধ্যে তোমার সর্ব্বোত্তম

একত্বের রহস্য আবিষ্কার—এ কি তোমারি পরা-ইচ্ছাকে একভাবে প্রকাশ করা পূর্ণ করা নয়?"[১১৯]

এইভাবে দেখলে শ্রীমা হলেন ক্ষুধার্ত্ত তমসাচ্ছন্ন বস্তুজগৎ ও শুদ্ধ আনন্দময় জ্যোতির্ম্ময় পরম সদ্‌বস্তুর মধ্যে একমাত্র সূত্র, সংযোজক ও সেতু। পৃথিবীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে শ্রীমা যদি বিনম্র নতজানু হয়ে করজোড়ে প্রার্থনা জানান, তখন তিনি বর্ত্তমানের শান্তি এবং ভবিষ্যতের মুক্তির জন্য কিছু কম অবতরণ করান না সেই অমৃতোল্লাসে বরদানে আশীর্বাচনে—

এখনও যাই হোক না তারা
আমাদের কাছে দিনের আলোর নির্ঝরিণী,
এখন তারা আমাদের দৃষ্টির কাছে নয়নাভিরাম;
তারাই আমাদের ঊর্দ্ধে ধরে তুলে, পালন করে,
সমর্থ আমাদের
কোলাহল-মুখর জীবনের যত বৎসরকে নীরব শাশ্বত
সত্তার কয়েকটি ক্ষণে ধরে দিতে,
সেই জাগ্রত সত্য সব
যাদের নেই আর বিনাশ।

এইভাবে ৯ই জুন, ১৯১৪ সালে শ্রীমা প্রতিনিধি হ'য়ে যে আশীষ পেলেন তা তিনি পৃথিবীকে জানালেন এই ভাষায়—

"প্রেমের এক বিপুল তরঙ্গ সকল জিনিসের উপর নেমে এসেছে, সকলের মধ্যে প্রবেশ করেছে।

১১৯। Prayers and Meditations p. 127

শান্তি, শান্তি হোক সকল পৃথিবীর—হোক বিজয় পরিপূর্ণতা মহাবিস্ময়!

হে আমার সন্তান সব, বেদনা-কাতর, জ্ঞানহীন তোমরা! আর তুমিও বিদ্রোহী প্রচণ্ডা প্রকৃতি, খোল তোমরা তোমাদের হৃদয়, শান্ত কর তোমাদের বেগ, এই দেখ প্রেম তার মধুর সর্ব্বশক্তি নিয়ে এসেছে, এই দেখ জ্যোতি তার বিশুদ্ধ ছটা নিয়ে তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেছে। এই যে মানবীয় এই যে পার্থিব মুহূর্ত্ত, সকলের চেয়ে শুভ মুহূর্ত্ত। প্রত্যেকেই, সকলেই জানুক, উপভোগ করুক, পূর্ণ পরিপূর্ণতার অধিকারী হয়েছে তারা।

আর্ত্ত হৃদয় কাদের, কাদের ললাট চিন্তাক্লিষ্ট! হে মূঢ় অন্ধতা, হে অজ্ঞান অপচিকীর্ষা, তোমাদের যন্ত্রণা শান্ত হোক, মুছে যাক।

এই যে নববাণী এসেছে তার ভাস্বর মহিমায়: 'আমি এখানে।' " ১২০

বাস্তবিকই শ্রীমা হলেন দিব্যদৃষ্টিসম্পন্না সহকর্ম্মিনী ও মহাশক্তিসম্পন্না যোগসূত্র—আবার সর্ব্বদা তিনি শ্রীমা, একান্ত মা।

শুধু এই নয়, এর পর আরও কিছু; কারণ যোগসূত্র ও সহকর্ম্মিনীই হলেন সৃষ্টিকর্ত্রী এবং কেবল শ্রীমা-ই নন, সামান্য তুচ্ছ মানুষটিও পর্য্যন্ত মূলত এই তিন। শ্রীমা দেখিয়েছেন যে "হতে হবে দর্পণের মত, সমানে প্রতিফলন করবে, সমানে

১২০। Prayers and Meditations pp. 131-132

থাকবে নির্ম্মল, দৃষ্টি রাখবে যুগপৎ বাহিরে ও ভিতরে, এক-দিকে প্রকাশের পরিণতি আর একদিকে প্রকাশের উৎস উভয়ের উপর, দেখবে যাতে কার্য্য সব তাদের কারণ ভাগবত এষণার সম্মুখে স্থাপিত হয়। মানুষের কর্ত্তব্য হল এই রকম হওয়া···দুটি ভাব মিলিয়ে ধরতে হবে, একদিকে নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করে যাওয়া, আর একদিকে সক্রিয়ভাবে সংসিদ্ধ করে চলা—ঠিক এইটি হল সবচেয়ে কঠিন কাজ। ভগবান, আর এইটিই তুমি চাও আমাদের কাছ থেকে। তবে তুমি যখন চেয়েছ তখন নিঃসন্দেহে সিদ্ধির উপায়ও তুমি আমাদের এনে দেবে।"[১২১] অবশেষে যখন আমরা এই অবসাদকারী অন্ধ অনুপযুক্ততা থেকে উঠে আসতে পারব তখন দাস না থেকেও উত্তম হবে আমাদের, অহং-ব্যষ্টির কারাঘরে আটক না হয়ে পাব সার্থক ব্যক্তিত্ব।[১২২] তখন ক্রমশঃ আমরা ছাড়িয়ে উঠব দুর্দ্ধর্ষ অহস্কার পার্থিব শত প্রমাদ, "বিশ্বব্যাপী যে প্রমাদ সহস্র সহস্র দৃষ্টান্তের মধ্যে পুনরাবৃত্ত হয়ে চলেছে।"[১২৩] এইভাবে যখন ব্যক্তিগত সত্তা নিজেকে বিস্তৃত, কলঙ্ক হ'তে মালিন্যমুক্ত করে এবং ঈশ্বরের সাথে মিলিত হবার প্রয়াস করে তখনই সেই সর্ব্বশক্তিময়ের অবরোহণ ও আমাদের প্রাকৃত সত্তার রূপান্তর এবং নবশক্তির ও নবরাজ্যের বিপুল সিদ্ধির শুভক্ষণ দেখা দেবে; এই বিপুল সিদ্ধি স্বপ্নমাত্র নয়, তা আসবে,

১২১। Prayers and Meditations p. 140

১২২। Prayers and Meditations p. 145

১২৩। Prayers ann Meditations p. 149

অবধারিত আসবে। ভক্ত ভগবান প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এই বিরাট রূপান্তর কর্ম্মের সংসাধনে। ভগবান যখন ভক্তকে আশ্বাস দিয়েছেন এই বলে, "যা হওয়া উচিত তা হবেই, যেমন প্রয়োজন তেমন যন্ত্রও তৈরী হবে, তুমি চেষ্টা করে যাও দৃঢ়-প্রত্যয়ের শান্তির উপর দাঁড়িয়ে।"[১২৪] তখন ভক্তও দিয়েছে তার সস্মিত উত্তর; "আমাকে আর দয়া দেখিও না, তোমার সর্ব্বশক্তি নিয়ে পূর্ণভাবে কাজ কর। তুমি যে আমার মধ্যে অখণ্ড রূপান্তরের আকাঙ্ক্ষা স্থাপন করেছ।"[১২৫]

সতের

১৯১৪ সালের ২১শে জুলাই—শ্রীমা এক আনন্দপূর্ণ একত্বতার অভিজ্ঞতা পান, যে অভিজ্ঞতা কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের "টিনটার্ন এ্যাবি"র থেকে বিশেষ পৃথক নয়:

সেই শান্ত কল্যাণী মানস বিহার,
যেখানে...এই মৃন্ময় দেহের নিঃশ্বাস,
আমাদের এই নরশোণিতের গতি পর্য্যন্ত
প্রায় নিস্তব্ধ, ঘুমন্ত আমরা
দেহীরূপে, অথচ হয়ে উঠি জাগ্রত আত্মা।

কিংবা কবি দান্তের "পারাডিসো"—

"যেমন হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে দর্শনেন্দ্রিয়কে চুরমার করে ভেঙ্গে দেয় যাতে স্পষ্ট জিনিসকেও চোখ দিয়ে দেখার

১২৪। Prayers and Meditations p. 151

১২৫। Prayers and Meditations p. 115

ক্ষমতা হরণ করে ; তেমনি আমার চারিপাশে এক জীবন্ত জ্যোতি যেন দেখা দিল, আমাকে ফেলে দিল সে প্রদীপ্তির বন্ধনজালে, আর কিছুই আমি দেখতে পেলাম না তারপর।"[১২৬]

"সীমাহীন একত্বের জ্যোতিতে বিহ্বল হয়ে
আমি অনুভব করলাম আমার সত্তার উপর পড়েছে
যেন একটি নির্ব্বাক মুহূর্ত্তের অলসভার—
অস্তগত শত শতাব্দীর যে ভার পড়েছিল
'আর্গো'র অপরিচিত সমুদ্রে পারাপারের অভিযানে
তার চেয়েও ভারী।"[১২৭]

শ্রীমার আনন্দোল্লাসের প্রোজ্জ্বল অসীমত্ব, যদিও তার স্বরূপ অনির্ব্বাচ্য, এই যথাযোগ্য প্রশান্তি ও স্বচ্ছতায় খানিকটা প্রতিফলিত—

"শরীর ছিল না, কোন রকম শারীর বোধও ছিল না—ছিল একটা আলোর স্তম্ভ, যেখানে সাধারণতঃ দেহমূল সেখান থেকে ঊর্দ্ধে উঠে গিয়েছে যেখানে মস্তক থাকে সেই অবধি, এখানে তা হয়েছে যেন আলোর একখানা থালা, চাঁদের মত। তারপর সেখান থেকে স্তম্ভটি আরো উঠে গিয়েছে, মাথা থেকে বহুদূরে, শেষে ফুটে উঠেছে প্রকাণ্ড এক প্রোজ্জ্বল নানা বর্ণময় সূর্য্যমণ্ডল হয়ে—এই সূর্য্য থেকে সোনালী আলো বর্ষণধারায় ঝরে পড়ছে, সারা পৃথিবী ছেয়ে ফেলছে।

১২৬। Book XXX, Translation by Philip H. Wicksteed.
১২৭। Book XXXIII, Translation by K. D. Sethna.

তারপর আলোকস্তম্ভটি নীচের দিকে আবার ফিরে এল, জীবন্ত আলোর একটা ডিম্বাকার ঘের হয়ে। প্রথমে মস্তকে, তারপর ক্রমে কণ্ঠ, হৃদয়, নাভি, মেরুদণ্ডমূল এবং আরো নীচে এই রকমে ধাপে ধাপে প্রত্যেক চক্রটিকে জাগিয়ে তুললে, সক্রিয় করলে, প্রত্যেকের নিজের ধারায়, আপন স্পন্দন বৈশিষ্ট্যে। জানুতে পৌঁছে উর্দ্ধমুখী আর অধোমুখী ধারা দুটি এক হল। এই রকম একটা নিরন্তর প্রবাহের মধ্যে আর কোন ছেদ রইল না, সমস্ত আধারকে ছেয়ে রাখল বিপুল এক আলোর ঘের।

ধীরে ধীরে তারপর চেতনা আবার নেমে এল ধাপে ধাপে, প্রত্যেক চক্রে থেমে থেমে যে পর্য্যন্ত দেহ-চেতনা ফিরে না এল। যতদূর মনে হয়, চেতনা দেহে ফিরে এল যেখানে তা হল নবম ধাপ। তখনও কিন্তু বাহ্যশরীর সম্পূর্ণ অচল আড়ষ্ট।"[১২৮]

সেণ্টজন্ অব দি ক্রুশ তাঁর নিজের আত্মোপলব্ধির বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন "তারপর আমি সব কিছু ভুলে গেলাম... সব গেল থেমে এবং আমার অস্তিত্বও লোপ পেল"। কিন্তু শ্রীমার উপলব্ধি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় শ্রীঅরবিন্দের "ট্রান্স্" (সমাধি), "ট্রান্স্ অব্ ওয়েটিং" (প্রতীক্ষার সমাধি) ও "ডিসেণ্ট" (অবতরণ) কবিতাগুলি—এগুলি সেই গুহ্য সাধনাবস্থার লিপিচিত্র যাতে জ্যোতিরুদ্ভাস ও ঈশ্বরানুভব ওতপ্রোত। অভিজ্ঞতা বলতে যা বুঝায় তা যদি বুদ্ধিগত

১২৮। Prayers and Meditations pp. 160-161

ভাষার সাহায্যে বলা যায়, তা হলে শ্রীমার অভিজ্ঞতাকে অভিষিক্ত করা যায় এই বলে যে তাঁর অভিজ্ঞতা হল আরোহণ ও অবরোহণের দ্বৈতগতি, দুটি যেন একটি অখণ্ড সৃষ্টিক্ষম শক্তি ও জ্যোতির মিলন।

শ্রীমা যে আত্মায় নির্ভর করে চলতেন শ্রমে ও বিশ্রামে, তার থেকে সংগ্রহ করতেন শক্তি সে বিষয়ে যেমন কোন সন্দেহ নেই, তেমনি কোন কারণে তিনি তাঁর জীবন ও আদর্শের কার্য্যকরী দিক একটুও অবহেলা করেননি। মঁসিয় রিশারের সঙ্গে শ্রীমা শ্রীঅরবিন্দের হাতে হাত মিলিয়েছিলেন এবং তাঁদের যুগ্ম সম্পাদকত্বে ইংরাজীতে "আর্য্য" ও ফরাসীতে "রেভ্যু দ্য গ্রঁাদ স্যঁাতেজ" নামক দুটি পত্রিকা যুগপৎ প্রকাশ করতে উদ্যত হলেন। এ প্রচেষ্টার দ্বিবিধ লক্ষ্য "আর্য্য"র প্রথম সংখ্যার মলাটে এই রকমে বর্ণনা করা থাকল—

"(১) জীবনের প্রধানতম সমস্যার ধারাবাহিক অনুধাবন; (২) প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সনাতন মানবধর্ম্মের বিভিন্ন ঐতিহ্যকে সৌষম্যে পরিণত করে জ্ঞানের বিরাট এক সমন্বয় স্থাপন করা। এর রীতি হবে বাস্তববাদের, যুক্তিসঙ্গত হয়ে আবার বিশ্বাতীত, এমন বাস্তববাদ যাতে বুদ্ধিগত ও বিজ্ঞান-সম্মত শৃঙ্খলার সাথে বোধিগত অভিজ্ঞতা এসে মিশবে।"

যদিও ফরাসী পত্রিকাটির নামই খানিকটা আত্মপরিচায়ক, কিন্তু "আর্য্য" নামটি প্রথমে বিভ্রান্তিকর হলেও মন্ত্রের ধ্বনি ও শক্তি বহন করে। শ্রীঅরবিন্দ পরে এই নামটি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে বলেন, "আর্য্য বলতে বুঝায় এক প্রয়াস বা উত্থান

এবং বিজয়। আর সে-ই হল আর্য্য যে অন্তরে ও বাহিরে যা-ই মানবোন্নতির প্রতিবন্ধক তারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ও তাকে পরাস্ত করে। তার প্রকৃতির প্রথম আইন হল আত্মজয় ...আর আত্মশুদ্ধি হ'ল আত্মজয়ের প্রধান লক্ষ্য। তাই যা সে জয় করে তাকে ধ্বংস করে না, বরং উন্নত ও পরিপূর্ণ করে তোলে। আর্য্য সর্ব্বদাই কর্ম্মী ও যোদ্ধা...সর্ব্বদাই অন্তরে ও বিশ্বে স্বারাজ্যের আগমনীর জন্যে যুদ্ধে রত।"[১২৯] মানুষ অকর্ম্মণ্য ও তুচ্ছ জীব নয়,—অন্তরের সামর্থ্যে তো নয়ই, বাস্তবিকই সে ত্রি-ভুবনের উত্তরাধিকারী, স্বাতন্ত্র্য থেকে সার্ব্বভৌমিকত্বে কম্বুরেখার গতিতে উর্দ্ধে সে উঠে যেতে পারে, এমন কি বিশ্বাতীতে পৌঁছেও নিষ্কৃতি পেতে পারে। আর্য্য ও তার পাল্টা ফরাসী পত্রিকার লক্ষ্য ছিল পাঠকদের আত্ম-জয় ও আত্মশুদ্ধির দ্বিবিধ নিয়মানুবর্ত্তিতা শিক্ষা দেওয়া, যাতে তারা এই ত্রি-ভুবনে যুগপৎ বাস করতে জানে, পারে "অধস্তনকে উর্দ্ধে উত্তোলন করতে, উর্দ্ধকে নিম্নের মধ্যে স্বাগত করতে" এবং শেষে নিজের সত্তার সর্ব্বাঙ্গ ধরে এক হয়ে যেতে পারে ত্রিগুণ ব্রহ্মের শক্তি জ্যোতি ও আনন্দের সঙ্গে।[১৩০]

আর্য্য ও রেভ্যু দ্য গ্রঁাদ স্যাঁতেজ এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৪ সালে আগষ্টে। অবশেষে মিথ্যার সাথে সত্যের, আঁধারের সাথে আলোর, কুৎসিতের সাথে

১২৯। Views and Reviews pp, 9-11

১৩০। Views and Reviews p. 12

সুন্দরের লড়াই বেশ জাঁকিয়ে আরম্ভ হল, এ যুদ্ধ যতখানি শ্রীঅরবিন্দের ততখানি শ্রীমায়ের এবং এর সঙ্গে সূত্রে বাঁধা মানবজাতির ভবিষ্যৎ।

আঠারো

অজ্ঞাতকুলশীল পণ্ডিচেরীতে আর্য্যের প্রকাশ আর য়ুরোপে রক্তাক্ত যুদ্ধের সূচনা—যে যুদ্ধ পরে বিশ্বব্যাপী রূপ ধারণ করল—প্রায় একসঙ্গে। ১৯১৪ সালের ২৮শে জুন হাব্স্‌-বুর্গের সিংহাসনের উত্তরাধিকারি ও তার স্ত্রীকে নিহত করল সার্বিয়া দেশের ২০ বছরের একটি যুবক। ১৯১৪ সালের জুলাই মাসে য়ুরোপে পররাষ্ট্র দপ্তর গুলিতে ব্যস্ততার ঝড় উঠল এবং শান্তি বনাম যুদ্ধ নিয়ে ক্রমবৃদ্ধিহারে আশঙ্কাপূর্ণ কিন্তু ক্রমলুপ্তিহারে আশাজনক তর্কবিতর্ক চলছিল। ২৮শে জুলাই অষ্ট্রীয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল; ৩রা আগষ্ট জার্ম্মানী করল ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং ৪ঠা আগষ্ট ব্রিটেন জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে। প্রথম মহাযুদ্ধ হল শুরু; জার্ম্মানী, অষ্ট্রীয়া, রাশিয়া, ফ্রান্স এবং ব্রিটেনের প্রত্যেকে প্রায় প্রথম থেকেই কোন না কোন পক্ষে যোগ দিল।

শেষে সভ্য মানুষ কি এক পরস্পর আত্মঘাতী সংঘে পরিণত হতে বসল? নিম্নলিখিত বাণীগুলি শ্রীমার অন্তর মথিত করে নিঃসৃত হ'ল:

"ভগবান। চিরন্তন অধীশ্বর।

শক্তিরাজির সংঘর্ষ মানুষকে জোর করে চালিয়ে নিয়েছে

—তারা অপরূপ আত্মবলিদান করে চলেছে, নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছে রক্তাক্ত পূর্ণাহুতির মধ্যে।

ভগবান! চিরন্তন অধীশ্বর! এ যেন বৃথা না যায়…।"[১৩১]

দু'দিন পরেই শ্রীমা লিখে জানালেন যে "পৃথিবীর মহা-সঙ্কটকাল উপস্থিত"[১৩২] এবং ৮ই আগষ্ট আবার লিখলেন, "পৃথিবীর উপর ঝঞ্ঝার মত নেমে পড়েছে বীভৎস শক্তি সব—অজ্ঞান তারা,উগ্র, বলবান, অন্ধ"।[১৩৩] শ্রীমা "যুদ্ধরত অন্ধকার পৃথিবী" থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেন না এবং ২১শে আগষ্ট শ্রীমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত হ'ল আর এক প্রার্থনা: "ভগবান, ভগবান, সমস্ত পৃথিবী পর্যুদস্ত, শোকমগ্ন, যন্ত্রণাগ্রস্ত মুমূর্ষুপ্রায়…এ বেদনারাজি বৃথা যেন তার উপর না এসে থাকে…অন্ধকারের এই গহ্বরতল হতে, পৃথিবী তার সমগ্রসত্তা দিয়ে তোমায় ভাবে, তুমি তাকে দেবে বাতাস আলো এই জন্যে ; তার যে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় তুমি কি আসবে না তার রক্ষার জন্যে" ?[১৩৪] অর্ধেক যন্ত্রণা আর অর্ধেক প্রার্থনা মিশ্রিত সেই একই তীব্র আর্তকণ্ঠ বার বার তাঁর মর্ম ভেদ করে ওঠে এবং এ কণ্ঠ সত্যই যেন বিশ্বমানবেরই আর্তকণ্ঠ, যে বিশ্বমানব আজ ভাগ্যের বিচারালয়ে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে, যার অগ্নিপরীক্ষা অশেষ ও অবর্ণনীয়:

১৩১। Prayers and Meditations p. 167

১৩২। Prayers and Meditations p. 169.

১৩৩। Prayers and Meditations p. 170

১৩৪। Prayers and Meditations p. 177

"ভগবান। পৃথিবী আর্ত্ত, শোকগ্রস্ত, এ জগৎ বিশৃঙ্খলার বাসগৃহ হয়ে উঠেছে।

অন্ধকার এত গাঢ় যে এক তুমি তাকে অপসারিত করতে পার।

এস প্রকাশ কর নিজেকে, তোমার কর্ম্ম সংসিদ্ধ হোক।"[১৩৫]

"পৃথিবীর উপর অন্ধকার নেমে এল গাঢ় হয়ে, প্রচণ্ড হয়ে, বিজয়ী হয়ে—স্থূল জগতে শুধু দুঃখ ভীতি ধ্বংস এবং তোমার প্রেমের আলো তার সব দীপ্তি নিয়ে শোকের আবরণতলে ডুবে গেল।"[১৩৬]

অপরদিকে তখনও আশা, স্বস্তি ও উৎসাহের মৃদু প্রায়-নীরব কণ্ঠ শোনা যাচ্ছিল—যদিও তা ছিল প্রথমে অতি ক্ষীণ, ক্রমশ তাতে ফুটে উঠল বিশ্বাসের পূর্ণ ভরসা, চরম বিজয়ের নিশ্চয়তা। ৩১শে আগষ্ট যুদ্ধের প্রথম মাসের শেষ দিনে শ্রীমা লিখলেন:

"এই যে ভীষণ অব্যবস্থা, এই যে দারুণ ধ্বংস, এরই মধ্যে লক্ষ্য করা যেতে পারে চলেছে বিপুল এক প্রয়াস—তার প্রয়োজন পৃথিবীতে নূতন বীজ রোপনের জন্যে; যে বীজ শোভন শীষ সব তুলে দাঁড়াবে, জগতে এনে দেবে নবজাতিরূপে শস্যসম্ভার..."[১৩৭] পাঁচ দিন পরে উর্দ্ধ হতে এল এক পুনর্মিলনের ডাক:

১৩৫। Prayers and Meditations p. 180

১৩৬। Prayers and Meditations p. 185

১৩৭। Prayers and Meditations pp. 182-183

"দাঁড়াও, বিপদের সম্মুখে।...দাঁড়াও স্থির দৃষ্টি নিয়ে বিপদের সম্মুখে, মহাশক্তির সাক্ষাতে তা যাবে মিলিয়ে।"[১৩৮] এ যুদ্ধের পিছনে নিহিত রয়েছে হয়ত কোন গূঢ় রহস্য । এ রহস্যের অর্থ এও হতে পারে যে তা নৈতিক নিশ্চলতা ও অন্ধ-ধ্বংস উভয়ের জয় বা স্বর্গের পথে পাপক্ষালক! তাই যা প্রয়োজন তা হল নির্ভয়ে যুদ্ধ করে যাওয়া এবং "চাই বিজয়, সর্ব্বস্ব পণ করে" ।[১৩৯]

ক্রমশ বিভ্রান্তি, উত্তেজনা, নৈরাশ্যের মেঘ থেকে উদিত হল বুদ্ধিবৃত্তি ও অচল জ্ঞানের সূর্য্য । "সেতু বন্ধের মত একদিকে শাশ্বত সত্তা—যা কখনও প্রকাশ পায় না, আর একদিকে যা প্রকাশ পেয়েছে এই দুয়ের মধ্যে···যা হওয়া উচিত আর যা হয়েছে এ দুয়ের মধ্যে সংযোগসূত্র।"[১৪০] মানুষ এছাড়া আর কি ? প্রত্যেক ব্যক্তি হল আসলে সে যা বা যা তার হয়ে ওঠা উচিত—স্থান ও কালের অতীত যে সদ্‌বস্তু তাকে উভয়ের মধ্যে, অরূপে যে সৎ ও সত্য তাকে রূপে প্রকাশের প্রয়াস । "বস্তু জগতের আপেক্ষিকতা"—মর অস্তিত্বের দ্বৈতভাব ও ব্যমিশ্রতার সঙ্গে মানুষ নিবিড় ভাবে জড়িয়ে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে । কিন্তু তেমনি আবার আসলে মানুষ হল প্রকৃত পরম সত্যের উত্তরাধিকারী, তাই ন্যায়সঙ্গত

১৩৮। Prayers and Meditations p. 186

১৩৯। Prayers and Meditations p. 187

১৪০। Prayers and Meditations p. 182

ভাবেই সে হল অন্তরে দ্বিধাভিন্ন জড় জগৎ এবং অন্তরাত্মিক আত্মসমর্থ আধ্যাত্মিক জগতের মধ্যে সংযোগ-সূত্র। শ্রীমা হলেন এক অপূর্ব্ব মধ্যস্থা, তাঁর বাণী মানুষের যাবতীয় যাতনা ও আস্পৃহাকে আলিঙ্গন করে এবং যখন তিনি তাঁর প্রার্থনা উচ্চারণ করেন তখন সারা পৃথিবী সেই প্রার্থনারই প্রতিধ্বনি করে এবং বিনীত আবেদনে সাগ্রহে যোগদান করে :

"এই আর্ত্ত পৃথিবীকে ঘিরে ধর তোমার করুণাদৃঢ় বাহু-পাশে, তোমার অসীম প্রেমের কল্যাণকর ধারায় পরিপ্লুত কর তাকে।

আমি তোমার করুণার দৃঢ় বাহুপাশ।

আমার প্রসারিত বুকে তোমার সীমাহীন প্রেম। আর্ত্ত পৃথিবীকে ঘিরে রাখে বাহুযুগল, উদার হৃদয়ের 'পরে তাকে আদরে চেপে ধরে ধীরে নেমে আসে পরম আশীষের চুম্বন এই দ্বন্দ্বক্লিষ্ট কণাটির উপর—সান্ত্বনাদায়ী নিরাময়কারী মায়ের চুম্বন'।"[১৪১]

"তাদের দুঃখ তাদের কষ্ট এই বাহ্য সত্তা অনুভব করছিল, ভগবান। কবে দূর হবে অজ্ঞান? কবে চলে যাবে বেদনা? ভগবান! এই কর যাতে বিশ্বের প্রত্যেক উপাদানটি তার মূল সত্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠে, লুপ্ত না হয়ে রূপান্তর লাভ করে। অন্ধ অহংকারের যে অবগুণ্ঠন তোমাকে ঢেকে রাখে, অপসৃত হোক তা, তোমার আলো ছড়িয়ে প্রকাশ হও তুমি

১৪১। Prayers and Meditations p. 175

পূর্ণ-রূপে, তবে সে প্রকাশ ঘটবে অখণ্ড চেতনার মধ্যে, একটা ক্রমোন্নতির ধারায়।"[১৪২]

উনিশ

মধ্যস্থ, সহকর্ম্মী, স্রষ্টা বাস্তবিকই মহাকালের 'এপারে' ও তীরে এই তিনটি পরস্পর সংযুক্ত চরিত্রের ভূমিকা অভিনয় করা আমাদের ভবিতব্য এবং এদের অনুক্রমে আমাদের ক্রমোন্মেষপর পার্থিব-জীবন-মহাকাব্যের সার সঙ্কলন। কখনও অজ্ঞানাচ্ছন্নভাবে, অপূর্ণভাবে, কখনও সচেতনভাবে, সক্ষম-ভাবে, কিন্তু সর্ব্বদা অব্যাহত ও অকুণ্ঠিতভাবে—এইভাবেই সাধারণ মানুষ বিবর্ত্তনের সৃষ্টিক্ষম অভিযানে যোগ দেয়। বুদ্ধিবৃত্তিকে বিশুদ্ধ করা, যন্ত্রটিকে পবিত্র করা, সুশৃঙ্খলাকে দৃঢ়বদ্ধ করা, সিদ্ধিটিকে ত্বরান্বিত করা—এই হ'ল পূর্ণ-যোগের কর্ম্মসূচী :

"সকল জড় আকারের মধ্যে তাদের জীবনীশক্তি হয়ে ওঠা, সকল রূপের মধ্যে এই জীবনীশক্তিকে সুশৃঙ্খলিত করে, ব্যবহার করে যে চিন্তাশক্তি তা হয়ে ওঠা, আর চিন্তাশক্তির নানাবিধ উপাদান সমস্তকে প্রসারিত করে, সমুজ্জ্বল করে, প্রখর করে এবং সম্মিলিত করে ধরে যে প্রেম-শক্তি তাই হয়ে ওঠা—আর এই ভাবেই ব্যক্ত-সৃষ্টির সঙ্গে অখণ্ডভাবে একীভূত হয়ে গিয়ে পূর্ণশক্তিতে তার রূপান্তর সাধনে অবতীর্ণ হওয়া।

অন্যদিকে, তা হ'ল আবার, পরমতত্ত্বের কাছে সম্পূর্ণ

১৪২। Prayers and Meditations p. 202

সমর্পণের ফলে, পরমসত্যের জ্ঞানলাভ, আর যে শাশ্বত ইচ্ছা-শক্তি তাকে প্রকাশ করে তার জ্ঞানলাভ ; এবং এই একাত্মতার জন্যে ভাগবতশক্তির অনুগত সেবক ও অভ্রান্ত যন্ত্র হয়ে ওঠা, আর মূলতত্ত্বের সাথে সজ্ঞান একাত্মতা, এই উভয় একাত্মতাকে সংযুক্ত করে ধরা ; সুতরাং পরিশেষে মূলতত্ত্বের সত্যধর্ম্ম অনুসারে সৃষ্টির মধ্যে সচেতনভাবে হৃদয়কে মনকে প্রাণকে ঢালাই করা, গঠন করা।

এই রকমেই ত ব্যক্তিগত সত্তা পরম সত্য আর ব্যক্ত বিশ্বের মধ্যে সচেতন মধ্যস্থ হয়ে উঠতে পারে, প্রকৃতির যোগ-সাধনায় যে ধীর অনিশ্চিত গতি তার মধ্যে অবতীর্ণ হয়ে, তাকে দিতে পারে দিব্য যোগসাধনার ক্ষিপ্র প্রখর গতি।"[১৪৩]

বিবর্ত্তনের গতিকে সঠিক দিকে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেওয়া,—প্রকৃতিকে প্রায় যেন নিয়মানুবর্তী করে তোলা,—এবং অগ্রগতিকে আরও ক্ষীপ্র করে তোলাই হ'ল মহান যোগীদের, স্রষ্টাদের লক্ষ্য। তাঁদেরই মধ্যে শাশ্বত পার্থিব জীবনের রূপ নিয়ে ধরা দেয় এবং যেহেতু তাঁরা যুগপৎ আমাদের সঙ্গে ও বাহিরে রয়েছেন, জড় প্রকৃতিকে অতি-প্রাকৃতে বিবর্ত্তনের যে অপূর্ব্ব নাটক চলেছে তাতে তাঁরা স্বীয় অংশ অভিনয় করাতে সমর্থ।

শ্রীমা এরূপ দ্রষ্টা যোগী এবং সর্ব্বসম্ভবা মধ্যস্থা হয়ে দুটি জগতের সংঘর্ষ অনুভব করেন এবং সেই সংঘাত ও কোলাহলের মন্থন থেকে তুলে ধরেন শান্তি ও সৌষম্যের পূর্ণকুম্ভ।

১৪৩। Prayers and Meditations p. 234

আর্ত্ত সন্তানকে যেমন তেমনি সমগ্র পৃথিবীকে তিনি কোলে নেন, ঠিক সে "পীড়িত শিশু যেন,তাকে নিরাময় করতে হবে, দুর্ব্বল বলেই তার উপর পড়েছে বিশেষ স্নেহ"[১৪৪]—স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে শ্রীমা শাশ্বতের ডাকে সাড়া দিয়েছেন এবং অকর্মক ও চিন্তাপ্লুত না থেকে কার্য্যকরী ও সিদ্ধিক্ষম যন্ত্রে নিজেকে রূপান্তরিত করলেন। যোগীরা অবাস্তব কল্পনাবিলাসী এই সাধারণ ভ্রান্ত ধারণা যোগীদের অনন্য জীবন-কাহিনী দিয়েই যুগে যুগে বারে বারে মিথ্যা প্রমাণিত হ'য়েছে। ডাঃ ইঙ্গে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, "মহান যোগীদের সকলেরই থাকে কর্ম্মতৎপরতা ও প্রভাব এবং তাঁদের কর্ম্ম-কুশলতা বহুক্ষেত্রেই অভূতপূর্ব্বভাবে পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণ : 'প্লটিনাস'কে প্রায়শ ডাকা হত অভিভাবক ও অছি হতে; 'সেণ্ট বার্ণার্ড' সংগঠক হিসাবে চমৎকার কুশলতা দেখিয়েছেন; 'সেণ্ট তেরেসা' বহু কনভেণ্টের প্রতিষ্ঠাতা ও শাসক হিসাবে তাঁর প্রখর বৈষয়িক বুদ্ধির ও যোগ্যতার পরি-চয় দিয়েছেন। ...সাধারণত যোগীরা উচ্চাকাঙ্ক্ষী নন কিন্তু আমার মনে হয় যে বৈষয়িক জীবনে কখনো ঢুকতে সম্মত হলে সেখানে তাঁরা বড় একটা ব্যর্থতার দৃষ্টান্ত দেখান না।"[১৪৫] তা হলে এ কোন মতেই আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে শ্রীমা স্থির প্রত্যয় নিয়ে এবং যুদ্ধে সানন্দে যোগদানের মনোভাব নিয়ে পূর্ণোদ্যমে সেই মহা-ক্ষণের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত। এত

১৪৪। Prayers and Meditations p. 203

১৪৫। Christian Mysticism pp, XI-XII

শুরুমাত্র, কিন্তু এ থেকে সূত্রপাত হতে পারে এক অর্থপূর্ণ কর্ম্মের ধারা-পরম্পরা যার প্রসার তিনি দিব্য দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেলেন :

"একটা আংশিক সীমাবদ্ধ সংগ্রাম যা হল পৃথিবীব্যাপী বিপুল সংগ্রামের প্রতিভূ, তার ভিতর দিয়ে তুমি আমার সামর্থ্য, আমার তৎপরতা, আমার সাহস পরীক্ষা কর ; দেখতে চাও সত্যসত্যই আমি, তোমার সেবক হতে পারি কিনা। যদি যুদ্ধের ফল দেখায় যে তোমার বিশ্ব-প্লাবন কর্ম্মের যন্ত্র হবার উপযুক্ত আমি, তাহলে কর্ম্মের ক্ষেত্র তুমি আরো প্রসারিত করবে।"[১৪৬]

পরের দিনেই—১৮ই জানুয়ারী ১৯১৫ তারিখে—শ্রীমা তাঁর আশার রূপটির আভাস দিলেন আরো খানিকটা স্পষ্ট ভাষায় :

"প্রেমের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের, ন্যায়ের বিরুদ্ধে অন্যায়ের, তোমার বিধানের কাছে আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের এই যে দুঃসাহসিক সংগ্রাম তার মধ্যে আমি যেন এক মহত্তর শান্তির জন্য মানবজাতিকে উপযুক্ত করে তুলতে পারি—যখন মানুষে মানুষে আত্মকলহ সব থেমে গিয়েছে, যখন মানুষী প্রয়াস সমগ্রভাবে নিযুক্ত হতে পারে তোমার ইচ্ছাকে ক্রমে সুষ্ঠুতর সমগ্রতর করে তোলবার জন্যে, তোমার লক্ষ্যের ক্রম-বিকাশের জন্যে।"[১৪৭]

১৪৬। Prayers and Meditations pp. 222-23

১৪৭। Prayers and Meditations pp. 223-24

পূর্ণযোগী ক্রীতদাসের মত মনগড়া সূত্রের, অচলায়তন প্রথার, আচার ব্যবহারের যান্ত্রিক প্রথা বা রীতির দ্বারা বদ্ধ হয়ে থাকতে অবশ্যই অস্বীকার করবেন। দুঃখের বিষয় "আমরা যা ভাবিনা কেন, যা বলিনা কেন, সত্য চিরকালই তার বাহিরে থেকে যায়।"[১৪৮] চরম ধারণা, সূক্ষ্মতম কল্পনা, মহত্তম আবেদন বারবার এবং নীরসভাবে উচ্চারিত হলে শেষে "এক সময়ে তাদের শতদলের যৌবন বসন্ত হারিয়ে বসে" এবং আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে মূল্যহীন হয়ে পড়ে। পূর্ণযোগী অতীত অভ্যাসের ও দুর্ব্বলকারী প্রচলিত প্রথার ধ্বংসাবশেষ দ্রুত অতিক্রম করে সম্মুখে এগিয়ে যান। তাঁরই প্রাণবন্যা দুর্বার যিনি শত রকমের বাধা মাড়িয়ে চলে যেতে পারেন, আদর্শের দিকে ঋজুভাবে অগ্রসর হতে পারেন, সন্দেহ দোলায় না দুলে ও মাঝপথে কোথাও বিশ্রামসুখে মগ্ন না থেকে আনন্দ-তোরণ সব আকস্মিক আক্রমণে জয় করে খুলে ফেলেন। মানুষী মাপকাঠি দিয়ে বিচার করলে যুক্তিসঙ্গত ভাবে বলা যায় যে এ হল অত্যন্ত কঠিন ও বিপজ্জনক দুঃসাহসিক কাজ; কিন্তু এ কাজ করতেই হবে, উর্দ্ধের নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে শ্রীমা করবেনই এ কাজ এবং লক্ষ্যে না পৌঁছান পর্যন্ত অবিচলিতও থাকবেন।

"সাধারণ মানুষের মধ্যে সাধারণ মানুষ হয়ে কাজ করে চল তুমি; এই বিশ্বপ্রকাশের মধ্যে তাদের চেয়ে অতিরিক্ত কিছুমাত্র তুমি নও, এই শিক্ষা লাভ কর তোমার জীবনধারায়;

১৪৮। Prayers and Meditations p. 215

তাদের জীবনধারার সঙ্গে সমগ্রভাবে নিজেকে মিলিয়ে ধর। কারণ তারা যতটুকু জানে, যতটুকু হয়ে আছে, সে-সব ছাড়িয়ে তোমার মধ্যে তুমি বহন করছ চির-ভাস্বর, অবিকম্পিত অগ্নিশিখা—তাদের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে ধরে, এইশিখাকেই তুমি নিয়ে আসবে তাদের মধ্যে। তুমি যদি বিচ্ছুরণ কর আলো, তবে তা উপভোগ করবার প্রয়োজন আছে কি তোমার? আমার প্রেম যদি তুমি বিতরণ করে চল, তবে প্রয়োজন আছে কি তোমার অন্তরে তুমি অনুভব করবে তার স্পন্দন? তাদের সকলের জন্যে তুমি হবে আমাতে-নিহিত আনন্দের বাহক, তবে কি প্রয়োজন তোমার তাকে সর্ব্বতো-ভাবে আস্বাদন করবার?”[১৪৯]

কুড়ি

‘রেভ্যু দ্য গ্রাঁ সাঁতেজ’ আর্য্যের ফরাসী সংস্করণ। ১৯১৫ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশ বন্ধ হওয়া, পর্য্যন্ত এ পত্রিকাটি শ্রীমার মন অনেক খানি জুড়ে বসেছিল। মাত্র সাতটি সংস্করণ প্রকাশ হ’তে না হ’তেই মহাযুদ্ধের সঙ্কটকাল সম্পাদকদের পত্রিকাটি স্থগিত রাখতে বাধ্য করল; কিন্তু আর্য্য আরও সাড়ে ছয় বৎসর খুবই নিয়মিতভাবে প্রকাশ হ’তে লাগল এবং কেবল ১৯২১ সালে তার প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল।

সম্পাদকীয় ও তত্ত্বাবধায়কী দায়িত্ব থেকে অবশেষে মুক্ত

১৪৯। Prayers and Meditations pp. 221-22

হয়ে শ্রীমা 'কামো মারু' জাহাজে পণ্ডিচেরী পরিত্যাগ করলেন এবং ফ্রান্স অভিমুখে যাত্রা করলেন। তখনও পর্য্যন্ত শ্রীমা জানতেন না যে তিনি এতে খুশী না দুঃখিত। বহির্মন শূন্যতায় পর্য্যবসিত হয়েছিল ও তিনি যেন একটি অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হয়েছেন। পণ্ডিচেরী সহরে এমন একটা কিছু ছিল যা তিনি পিছনে ফেলে চলে এসেছেন। সত্যই কি পণ্ডিচেরীর সব স্মৃতিটুকু মুছে গেল। তা অসম্ভব। কোথায় তাঁকে নিয়ে যাচ্ছে, এ ঘনঘোর কী, কোন প্রচণ্ড অজ্ঞানতা ঘনীভূত হয়ে আছে তাঁর সামনে? জাহাজে ৩রা মার্চ ১৯১৫ সালে তাঁর এই যাতনাগ্রস্ত চঞ্চল মানসিক অবস্থাকে বর্ণনা করার সঠিক ভাষা পেলেন :

"কঠোর নিঃসঙ্গতা-আর নিরন্তর তীব্র অনুভব যেন একটা অন্ধকারের নরকের মধ্যে আমাকে সোজা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে।...ভগবান, আমি কি করেছি যার জন্যে এমন আঁধার রাত্রির মধ্যে আমাকে ফেলে দিয়েছ?"[১৫০]পরের দিন আবার লিখলেন :

"সেই একই কঠোর নিঃসঙ্গতা...'ভগবান, তুমি আমায় গাঢ়তম অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখছ...তবে কি তুমি আমায় নির্ব্বাচিত করেছ তোমার মশালধারী হয়ে নরকের ঘূর্ণিপাকের মধ্যে নেমে যাবার জন্যে।'[১৫১]

শ্রীমা অনুভব করলেন যেন তিনি "আত্মার ঠিক সম্পূর্ণ

১৫০। Prayers and Meditations p. 225.

১৫১। Prayers and Meditations pp. 226-27

বিপরীত যে-সব ব্যবস্থা তারই দিকে"[১৫২] যেন দ্রুতই অগ্রসর হয়ে চলেছেন এবং সবিস্ময়ে ভাবলেন জীবনে তাঁর কেন এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটল, এ কি আত্মার তমসাচ্ছন্ন-রাত্রি অতিক্রমণের শিক্ষা? কেন তাঁর এমন আধ্যাত্মিক নিঃস্বতার অভিজ্ঞতা, কেনই বা এ শূন্যতা, এ যাতনা, সমগ্র আধারের অলস আড়ষ্টতা?

এ সব অবস্থা অস্থায়ী মাত্র—শ্রীমা সমগ্র মানুষ ও প্রকৃতির ভূমিকা অভিনয় করলেন এবং এই বেপরোয়া ভাব নিয়ে উঠলেন যাতে সেই পরমকরুণাময় অনুকূল ও নিকটতম পথে এসে সাড়া দিতে পারেন। শ্রীমার সমতা অবিলম্বে ফিরে এল এবং তাঁর সেই স্থৈর্য্যের স্থির কেন্দ্র ও প্রচণ্ড উদাসীনতার পুরানো পথ খুঁজে পেলেন। তিনি কর্ম্মের মধ্যে নিজেকে কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ করলেন এবং উদ্বিগ্নতা ও ভীতিকে দিলেন নির্ব্বাসন।

"জগৎ থেকে পলায়ন নয়—মলিনতার, কদর্য্যতার ভার শেষ অবধি স্কন্ধে বহন করে চলতে হবে—ভগবানের সহায় থেকে বঞ্চিত হলেও দৃকপাত না করে। রাত্রির কোলের মধ্যে থাকতে হবে, চলতে হবে, দিক-যন্ত্র বিনা, আলো বিনা, আন্তর দিশারী বিনা।"[১৫৩]

নিবিড় আঁধার রাত্রি নিজেই নিজেকে নিঃশেষিত করে ফেলেছে। ধূসর উষার আগমনী দেখা দিয়েছে; এ হল

১৫২। Prayers and Meditations p. 227

১৫৩। Prayers and Meditations p. 229

প্রাণ-স্পন্দন শুরুর পূর্ব্বেকার নিঃশব্দ মুহূর্ত্ত ; "এ নাস্তি বটে, কিন্তু এমন নাস্তি বা বাস্তব, চিরকাল যা বর্ত্তে থাকতে পারে।"[১৫৪] পূর্ব্বাকাশে যখন জ্যোতিকুণ্ডের আবির্ভাব হয়, তখনই কুয়াসা বিদূরিত হয়, আলো ও প্রাণের প্রাদুর্ভাব হয়, যদি সে প্রাণ একটু বেশ তীক্ষ্ণ ও বিভ্রান্ত :

"স্বর্গ জয় হয়েছে নিঃসন্দেহে—কোন জিনিষের কোন ব্যক্তির ক্ষমতা নাই তাকে আর আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেয়। কিন্তু পৃথিবীর জয় এখনও বাকী ; তার কাজ চলেছে বটে, তবে দুর্যোগের ভিতর দিয়ে—আর জয় হলেও তা এখনো হবে আপেক্ষিক মাত্র।"[১৫৫]

অবশেষে শ্রীমা প্যারিসে ফিরে গেলেন ; কিন্তু বিবর্ত্তন-অভিযানের যে চরম বিজয় সে সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই রইল না। তাই তিনি ২রা নভেম্বর ১৯১৫ সালে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন যে :

"ভ্রান্তি সব হয়ে উঠেছে সোপান-শ্রেণী, অন্ধ-অন্বেষণ হয়ে উঠেছে বিজয় সিদ্ধি। তোমার মহিমা পরাজয়কে শাশ্বত জয়ে পরিণত করে ; অন্ধকার সব অন্তর্ধান করল, তোমার প্রোজ্জ্বল জ্যোতির সম্মুখে।

"তুমিই ছিলে প্রেরণা ও লক্ষ্য, তুমিই কর্ম্মী ও কর্ম্ম।"[১৫৬]

আধ্যাত্মিক আনন্দের জোয়ার দিক পরিপ্লাবী বেগে দেখা

১৫৪। Prayers and Meditations p. 232

১৫৫। Prayers and Meditations p. 236

১৫৬। Prayers and Meditations P. 239

দিল এবং ১৯১৫ সালের ২৬শে নভেম্বর শ্রীমা এক পরম অনির্ব্বাণ আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভ করলেন:

"চেতনা সম্পূর্ণ ডুবেছিল ভগবানের ধ্যানে···স্থূল দেহ, প্রথমে তার নিম্নতর অঙ্গগুলি, পরে সমগ্রভাবে, একটা পুণ্য-স্পন্দনে শিহরিত; ক্রমে জড়তম অনুভবেরও সকল ব্যক্তিগত সীমানা খসে পড়ল। সত্তা বৃহৎ হতে বৃহত্তর হয়ে উঠল, ধাপে ধাপে,সুনিয়মিতভাবে, সকল জাঙ্গাল ভেঙ্গে দিয়ে, সকল বাধা কাটিয়ে, যাতে সে ধারণ করতে পারে, প্রকাশ করতে পারে, প্রসারে তীব্রতায় নিরন্তর বর্দ্ধমান এক মহাবল, এক মহাশক্তি। এ যেন দেহের যাবতীয় কোষ ক্রমে স্ফীত হয়ে চলেছে, শেষে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে। আকাশের প্রসারে সুসমঞ্জসভাবে এই যে পৃথিবীমণ্ডল ঘুরে চলেছে, জাগ্রত চেতনার দেহ যেন তাই হয়ে উঠেছে—তবে চেতনা জানে তার পার্থিব-মণ্ডলাকার দেহ এ রকমে চলেছে বটে, কিন্তু বিশ্বপুরুষের আলিঙ্গন-বদ্ধ হয়ে, তারই কাছে নিজেকে দিয়ে দিয়েছে, ছেড়ে দিয়েছে প্রশান্ত আনন্দে বিভোর হয়ে। তখন চেতনার অনুভব হল, তার দেহ বিশ্বের দেহের মধ্যে মিশে গিয়েছে, এক হয়ে গিয়েছে; চেতনা তাই হয়ে উঠেছে বিশ্বের চেতনা, তার নিশ্চল সমগ্রতা নিয়ে আবার তার আপনার অন্তর্গত সচল সব অনন্ত-বৈচিত্র্য নিয়ে। বিশ্বের চেতনা আবার ছুটল ভগবানের দিকে, তীব্র আস্পৃহা আর পূর্ণ সমর্পণ নিয়ে—দেখল সে নিষ্কলঙ্ক জ্যোতির প্রভামণ্ডলে প্রজ্বলন্ত পুরুষ বহুশীর্ষ এক সর্পের উপর দাঁড়িয়ে,

সর্পটির দেহ পৃথিবীকে জড়িয়ে ধরেছে অনন্তভাবে। আর সে-পুরুষ তাঁর সনাতনী বিজয়-ভঙ্গিতে সর্পটিকে ও সর্প হতে নিঃসৃত বিশ্বকে যুগপৎ দমনে রেখেছেন এবং সৃষ্টি করছেন। সমগ্র বিজয়ী শক্তি নিয়েই তিনি সর্পটির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন—সে অঙ্গভঙ্গি বিশ্বগ্রাসী সর্পটিকে প্রতিহত করে রেখেছে যেমন, আবার তেমনি নিরন্তর পুনর্জীবিত করে চলেছে। চেতনা তখন সেই পুরুষই হয়ে উঠল, দেখল তার রূপ আবার বদলে গেল, মিলে মিশে গেল এমন একটা জিনিসের মধ্যে যার নিজের রূপ নাই, যাতে রয়েছে সকল রূপ, অব্যয় অক্ষয় জিনিস একটা, দ্রষ্টামাত্র সাক্ষীস্বরূপ। আর সে যা দেখে, তাই আছে। তারপর রূপের শেষ-চিহ্ন লোপ পেয়ে গেল, চেতনা পর্য্যন্ত ডুবে মুছে গেল অনির্ব্বচনীয়ের অবাচ্যের মধ্যে।"[১৫৭]

একুশ

১৯১৫ সালে প্যারিস সহরটা নিশ্চিন্ত বসবাসের পক্ষে ততটা অনুকূল ছিল না এবং সেখানে শ্রীমার সমতা নিশ্চয়ই অতি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল। সব সত্ত্বেও তাঁর অন্তরে ছিল শান্তি। এমন কি তাঁর শক্তিও সব সময়েই থাকত প্রস্তুত প্রত্যেক আহ্বানের প্রত্যুত্তর দেবার জন্য এবং তাই বিজয় সম্বন্ধেও তিনি কখনই সন্দেহ পোষণ করেন নি। শ্রীমার অধ্যাত্মজীবনের ইতিকথা প্রায় মাস চারেকের

১৫৭। Prayers and Meditations pp.241-42

আলেখ্য—তাই একে আমরা শ্রীমার ধ্যান ও প্রার্থনা বলে অভিহিত করতে পারি। ইতিমধ্যে তিনি এবারে জাপানে শুরু করে দিয়েছেন তত্ত্বানুসন্ধানের ও তত্ত্বাবিষ্কারের অভিযান। ৭ই জুন ১৯১৬ সালে টোকিওতে অবশেষে শ্রীমা লিখলেন :

"দীর্ঘ কয়েক মাস কেটে গেল, তখন কিছু বলা সম্ভব হল না। কারণ সে গেল একটা অবস্থান্তরের সময়, এ স্থিতি হতে আর এক বৃহত্তর পূর্ণতর স্থিতিতে উত্তরণ। বাহিরের অবস্থাও হয়েছিল জটিল, অভিনব—আধারের প্রয়োজন যেন ছিল অনেক অনুভূতি, অনেক পর্য্যবেক্ষণ সংগ্রহ করা যাতে তার অভিজ্ঞতা পায় একটা প্রশস্ত ও বহুমুখী প্রতিষ্ঠা।...হঠাৎ ৫ই জুন তারিখে পরদা ছিঁড়ে গেল, চেতনার মধ্যে আলো ফুটে উঠল।"[১৫৮] পরবর্তী স্তরে পৌঁছিবার আগে প্রায় ছয় মাস কেটে গেল ; সে সম্বন্ধে বলার সামান্যই আছে, কারণ "কোনরূপ উত্তেজনামূলক অভিজ্ঞতা ত নেই ; এ সব অভিজ্ঞতাই মনে হয় এখন অতি সহজ, সাধারণ।"[১৫৯] কিন্তু এই যে আপাতশূন্যতা ও সরলতা তা কেবল অন্তরের বিপুল ঐশ্বর্য্যকে ঢেকে রেখেছে। এরি জন্যে দৃষ্টি তাঁকে খুলতেই হবে এবং এক অপার আনন্দই যা তাঁকে ঘিরে রেখেছে চারিদিক থেকে তা হল :

"এই যে মলিন বিবর্ণ ধূসরতা, এই যে ঔজ্জ্বল্যহারা আলো, তারই মধ্যে আমি লাভ করি যেন অন্তহীন প্রসারের

১৫৮। Prayers and Meditations pp. 246

১৫৯। Prayers and Meditations p. 248

আস্বাদ। বৃহতের নির্মল নিশ্বাস, মুক্ত শিখরের সবল হাওয়া আমার হৃদয় পরিপূর্ণ করেছে, জীবন পরিপ্লুত করেছে। অন্তরের ও বাহিরের আমার সকল বাধা ভেঙ্গে গিয়েছে। আমার মনে হয় পাখীর মত আমি যেন পাখা মেলে দিয়েছি অবাধে উর্দ্ধে উড়ে চলবার জন্যে।"[১৬০]

১৯১৬ সালের ৫ই ডিসেম্বরে শ্রীমা এক অভিন্ন একাত্মতার মধ্যে পরমার্থ আনন্দের গভীরতার মাঝে নিজেকে নিয়ে গিয়েছিলেন—এমন কি তাঁর মন, চেতনা ও সবকিছুই তাতে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। ভগবানকে পেতে হলে দৃষ্টি ফেরাতে হয় সুদূর আকাশের দিকে, অগম্য আকাশের ওপারে নয়ন ফেরাই যখন বুঝি তখন সত্যের জ্ঞান আমাদের কতই না অকিঞ্চিৎকর। আমরা বরং দৃষ্টি ফেরাব পৃথিবীর পানে এবং সেখানে দেখব সেই পরম তিনি আমাদেরই সামনে। এ সম্বন্ধে শ্রীমার এক জ্বলন্ত অভিজ্ঞতা আছে :

"জাপানের একটি রাস্তা, উজ্জ্বল বর্ণের সুসজ্জিত সুশোভিত জাপানী উৎসবের লণ্ঠনে রাস্তাটি আলোকিত। তার মধ্যে এই সচেতন সত্তা এগিয়ে চলতে চলতে দেখল প্রত্যেকের অন্তরে সমস্তের অন্তরে ভগবান দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠেছে। একখানা ছোট্টটো হাল্কা ঘর দেখা গেল, স্বচ্ছ তা, একটি মেয়ে তার ভিতরে টাটামীর[১৬১] উপর বসে, পরিধানে উজ্জ্বল সোনার রঙে কাজ করা একখানা বেগুনী কিমোনো।

১৬০। Prayers and Meditations p. 249

১৬১। অর্থ—গদি

মেয়েটি সুন্দরী, বয়স প্রায় পয়ত্রিশ আর চল্লিশের মাঝামাঝি। সোনালী রঙের-"সামিসেন"-যন্ত্র বাজাচ্ছিল সে। পায়ের কাছে বসেছিল একটি ছোট ছেলে—মেয়েটির মধ্যেও দেখলাম ভগবান।"[১৬২]

শ্রীমার জাপানের রাস্তায় এই ভগবান-দর্শন আর শ্রীঅরবিন্দের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে আলিপুর জেলের আবেষ্টনীর মধ্যে—'আশ্রমবাসের' সময়—সর্ব্বভূতে বাসুদেব-দর্শনের সাথে রয়েছে এক অপূর্ব্ব সাদৃশ্য :

"যে-জেল আমাকে মানব-জগৎ থেকে আড়াল করে রেখেছে সেইদিকে আমি তাকালাম, কিন্তু দেখলাম আমি আর উচ্চ দেওয়ালের মধ্যে বন্দী নই; আমাকে ঘিরে রেখেছেন বাসুদেব। আমার সেলের সম্মুখবর্ত্তী বৃক্ষের ছায়ার তলে আমি বেড়াতাম, কিন্তু আমি যা দেখলাম তা বৃক্ষ নয়; জানলাম তা বাসুদেব, দেখলাম সেখানে শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডায়মান রয়েছেন এবং আমার উপর তাঁর ছায়া ধরে রয়েছেন। আমার সেলের দরজার গরাদের দিকে তাকালাম, আবার বাসুদেবকে দেখতে পেলাম। নারায়ণ দাঁড়িয়ে থেকে আমার উপর পাহারা দিচ্ছিলেন।"[১৬৩]

এর পর থেকে ভগবানই হলেন শ্রীমার নিত্যসাথী ও প্রেমাস্পদ এবং যেমন শ্রীমার কাছে তেমনি শ্রীঅরবিন্দেরও কাছে, প্রেরণা ও অন্তরের বিধি সব-কিছুরই উৎস

১৬২। Prayers and Meditations p. 251

১৬৩। Uttarpara Speech.

অন্তরস্থ ভগবান—যিনি সর্বভূতান্তরস্থ ঈশ্বর এবং পরম সত্য।

যতদিন যায়, দিন থেকে সপ্তাহ যায়, সপ্তাহ থেকে মাস যায় শ্রীমার সামনে তত তীব্রভাবে, এমন কি অনিবার্য্যভাবে, ফুটে উঠেছিল পার্থিবলোকে তাঁর ভবিষ্যৎ কর্ম্মধারা। সোপানাবলীর শেষ ধাপে তিনি পৌঁছেছেন, সীমান্তের উন্মুক্ত গহ্বরে—অনির্ব্বচনীয় নির্বাণের মধ্যে ঝাঁপ দিতে উদ্যত,—তখনই তাঁকে ফিরতে হল পৃথিবীর পানে, পার্থিব প্রকৃতির ভার বহন করতে ও তার "বিষাদের পথ অতিক্রম করতে"। কর্ম্ম? সংঘ? কি তার রূপ বা কি তার ভবিষ্যৎ—ভাবতেন শ্রীমা। যদি পরাজয় হয়? শ্রীমা পেলেন আশ্বাসবাণী এইভাবে:

"ভয় নাই, প্রাণ সত্তাকে কর্ম্ম শুরু করতে দেওয়া হবে না, তোমারও সংগঠন-সামর্থ্যের সমস্ত প্রয়াসকে প্রয়োগ করতে বলা হবে না, যতক্ষণ না প্রস্তাবিত কর্ম্ম এতখানি বিশাল ও সম্পূর্ণাঙ্গ না হয়ে ওঠে যাতে সত্তার যাবতীয় গুণগুলি পূর্ণ-ভাবে যথাযোগ্যভাবে ব্যবহার করতে পারে। কাজটি ঠিক কি হবে, তা তুমি জানবে যখন তা এসে উপস্থিত হবে। কিন্তু এখন থেকেই আমি তোমাকে জানিয়ে রাখি, যাতে তুমি তার জন্যে তৈরী থাকতে পার, তাকে ঠেলে না সরিয়ে দাও। আমি তোমাকে আর প্রাণসত্তাকেও—জানিয়ে রাখি অনুদ্বেল সাম্যময় শান্তিময় ক্ষুদ্র জীবনের দিন চলে যাবে, দেখা দেবে প্রয়াসের, বিপদের, অপ্রত্যাশিতের, অব্যবস্থার অথচ

তীব্রতার যুগ; এই ব্রতের জন্যই তুমি তৈরী হয়েছ।...এরই জন্যে ত তোমাকে তৈরী করে তুলছি আমি, এরই জন্যে ত তুমি নিজেকে সুনম্য করে সমৃদ্ধ করে ধরবার একটা সাধনার ভিতর দিয়ে চলেছ। কোন রকম কষ্ট প্রয়াস করতে যেও না—প্রয়োজন অনুসারে শক্তি আসে।...অনন্ত কাল ধরেই ত তোমাকে আমি নির্ব্বাচিত করে রেখেছি, পৃথিবীর উপর তুমি আমার অপ্রতিম প্রতিভূ হয়ে থাকবে, অদৃশ্যভাবে গোপন-ভাবে নয়, প্রত্যক্ষভাবে, সকল মানুষের চক্ষুর সম্মুখে। যা হবার জন্যে তুমি সৃষ্ট হয়েছিলে তাই তুমি হবে।"[১৬৪]

শ্রীমা, সেই মা, অসীম যিনি হয়েছেন সসীম, যিনি মহা-কালকে কালের মধ্যে ধরেছেন, এমনি করেই তিনি সম্যক-রূপে তৈরী হলেন, তাঁর উপর অর্পিত বিবর্ত্তনের প্রবাহ এগিয়ে নেবার কাজটি সুসম্পন্ন করার জন্যে। এই থেকেই শ্রীমা পরমাত্মা ও তার নানা বিভূতির সাথে নিয়তই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে যুক্ত। ১৯১৬ সালের ২০শে ডিসেম্বর মাসে করুণার পরাকাষ্ঠা প্রভু শাক্যমুনির কাছে থেকে শ্রীমা পান যে এক বাণী তা হল:

"শোন তবে, আমিও ইতস্ততঃ করেছি দিনের পর দিন কারণ,ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি দিয়ে আমি স্পষ্ট দেখছিলাম আমার বাণী, আমার বাণীর পরিণাম কি হবে শেষে—বুঝাবার ও বুঝবার ক্ষমতালোপ। কিন্তু তবুও ত আমি পৃথিবীর দিকে মানুষের দিকে ফিরেছি, আমার বাণী তাদের আমি দিয়েছি। 'পৃথিবীর

১৬৪। Prayers and Meditations pp. 253-55

দিকে, মানুষের দিকে ফিরে দাড়াও'—এই আদেশই কি সর্ব্বদা তুমি শুনছ না তোমার হৃদয়ের মধ্যে ?"[১৬৫]

আবার ১৯১৬ সালের ২৫শে ডিসেম্বরের আগের দিনের সন্ধ্যায় নীরবতার মাঝে যে বাণী শুনেছিলেন তারও প্রতি-লিপি শ্রীমা রেখেছেন :

"সব তুমি ত্যাগ করেছ, জ্ঞান পর্য্যন্ত, চেতন পর্য্যন্ত, তাই তোমার হৃদয়কে তুমি তৈরী করে তুলতে পেরেছ যে ভূমিকায় তোমাকে নামতে হবে তার জন্যে—সে ভূমিকায়, দেখতে মনে হয়, লাভের অঙ্ক শূন্য—প্রস্রবণ-উৎসের মত সে কেবল ঢেলেই চলেছে তার সমস্ত ধারা সকলের জন্য, কিন্তু তার দিকে কোন ধারাই ফিরে উঠে চলে না ; তার অফুরন্ত সামর্থ্য সে গভীর অতল থেকে টেনে তোলে, বাহিরে থেকে কোন কিছুর অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তুমি ত এরই মধ্যে অনুভব করতে শুরু করেছ এই যে প্রেমের অফুরন্ত প্রসার তাতে রয়েছে কি পরমানন্দ। কারণ প্রেমই ত আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, পরস্পরের বিনিময় প্রয়োজন তার নাই···তোমার সিদ্ধির পুরস্কার হবে অমূল্য রত্ন এক।"[১৬৬]

এই মা যেন সুন্দর স্বচ্ছ স্ফটিক—স্বয়ংসম্পূর্ণ ও ভবিষ্য-কর্মের জন্য প্রস্তুত ; মর্ত্ত্যের উপর দিব্যজীবনের জ্যোতির্ম্ময় সিদ্ধি সংসাধনের উদ্দেশ্যে সকল শ্রম গ্রহণে প্রস্তুত।

১৬৫। Prayers and Meditations p. 260

১৬৬। Prayers and Meditations pp. 264-265

বাইশ

একদিকে স্বার্থ ও অন্য দিকে নিঃস্বার্থ কর্ম্ম, একদিকে ব্যক্তিগত উন্নতি সাধনের জন্য কর্ম্ম ও আর একদিকে ঈশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে কর্ম্ম-সমর্পণ—মধ্যে রয়েছে কি এক বিপুল বিস্তার ও ঊষর ভূমি, কতনা গোঁজামিল ও আপোষ-রফা, নিরুদ্বিগ্নতার কত না মরূদ্যান ও পান্থশালা। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ যেন না থাকে : পরেই হোক আর আগেই হোক স্বার্থপূর্ণ কর্ম্ম আত্মবিরোধী এবং শুধু সেই কর্ম্মই কর্ম্ম যা হবে "সহজ ও সরল, যার উদ্দেশ্য তোমার করুণা বিকিরণ।"[১৬৭] কর্ম্মের মূল-সূত্রটি সৌন্দর্য্যের লীলা ও আনন্দ বিচ্ছুরণ বাদ দিয়ে নয়। পুরুষোত্তম কেবল সত্য নন, সুন্দর এবং আনন্দও বটে। ১৯১৭ সালের ২৭শে মার্চ নিত্যনৈমিত্তিক ধ্যানের মধ্যে এক অপূর্ব্ব "সংলাপ আকারে বাণী" পেলেন শ্রীমা। ভক্ত ও ভগবান দাঁড়িয়ে মুখোমুখী ; দীর্ঘস্থায়ী সর্বশেষ কুয়াসা অপসারিত হল, আকাশ হল উজ্জ্বল, মেঘমুক্ত এবং সূর্য্যদেব তাঁর পূর্ণ মাধ্যাহ্নিক দীপ্তি নিয়ে উদ্ভাসিত হলেন এবং সঙ্কল্প ও ভবিষ্যদ্বাণী সব তৃপ্তির ও সম্ভাব্য আশায় পরিপূর্ণ হল :

"তুমি হবে কাঠুরে, ইন্ধনের জন্য কাঠের আঁটি বাঁধবে বলে।

"তুমি হবে হংসরাজ, পাখা মেলে উড়ে চলবে, তার মুক্তাশুভ্র ছটায় দৃষ্টি সব শুদ্ধ করে দেবে, তার পালকের শ্বেত আভায় হৃদয় সব তপ্ত করে তুলবে।

"তুমি সকলকেই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে তাদের পরম সার্থকতার অভিমুখে।"[১৬৮]

প্রসন্নতা ও স্বাচ্ছন্দ্য হল তাঁরই, নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বেকার বিশ্রামের মুহূর্ত্ত তাঁরই, প্রতিবেদনশীল জাপান শ্রীমাকে যে অর্ঘ্য দিয়েছিল সেই সদিচ্ছার মূল্যবান আভরণ সেও তাঁর। আত্মসমাহিত ধ্যানে চিত্ত নিয়ে—যা এখন স্বভাবের মত মুদ্রাগত হয়ে দাঁড়িয়েছে—শ্রীমা অসীমকে ক্ষুদ্র বালুকণার মধ্যে উপলব্ধি করলেন, মুহূর্ত্তের ক্ষুদ্র পাত্রে চিরন্তনকে সংগৃহীত করলেন :

"আমি দেখতে পেলাম একটি চেরী ফুলের সঙ্গে আমি একাত্ম হয়ে গিয়েছি। তারপর এ ফুলটির ভিতর দিয়ে যাবতীয় চেরী ফুলের সঙ্গে মিলিত হয়ে গেলাম। তারপর চেতনার আরো গভীরে নেমে গিয়ে, একটা নীলাভ শক্তির স্রোতে চলে, আমি হয়ে উঠলাম একেবারে চেরী-গাছটিই, আকাশের দিকে আমার বাহুরই মত শাখা সব পুষ্পার্ঘ্যভার নিয়ে প্রসারিত।...মানুষের দেহ আর গাছের দেহে কি প্রভেদ? কোনই প্রভেদ নাই বস্তুত—যে চেতনা উভয়কে অনুপ্রাণিত করে তা এক অভিন্ন।"[১৬৯]

"আকাকুরা" সহরের বিরাট পর্ব্বত ও তাদের অসীম শান্তির পরিবেশে, তাদের মনোরম নীরবতা ও অখণ্ড

১৬৭। Prayers and Meditations p. 271

১৬৮। Prayers and Meditations p. 277

১৬৯। Prayers and Meditations pp. 281-82

সৌষম্যের সঙ্গে অপূর্ব্ব একাত্মতায় শ্রীমার হৃদয় স্পন্দিত এবং এইরূপে তিনি "তোমার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন একাত্মতার অখণ্ড আনন্দ" অনুভব করেন। সূর্য্য-কিরণের মাঝে শীকর-সম্পাতের মত, উৎফুল্ল শিশুর মত, তিনি হাসেন, কাঁদেন এবং তাঁর পরমেশ্বর ও প্রেমিকের সাথে অনন্তকালের জন্য একাত্মতায় আবদ্ধ।

তেইশ

ওইওয়েক, ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯১৯

সেদিনটি হল ভাগ্য-নির্দ্দেশের দিন। শ্রীমা লিপিবদ্ধ করলেন যে, "এত অনুরাগ দিয়ে, এত যত্ন দিয়ে যে ভোজ্য আমি তৈরী করলাম, মানুষ তা চাইল না, তাই ভগবানকে ডাকলাম গ্রহণ করতে।"[১৭০] কিছুক্ষণ থেকেই শ্রীমা আবার লিখলেন এই প্রসঙ্গে, "ভগবান তুমি ত গ্রহণ করলে আমার আমন্ত্রণ, আমার পাতা আসনে এসে বসলে আর আমার এই তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর নৈবেদ্যের পরিবর্ত্তে আমায় দান করলে শেষ মুক্তি···ধাপে ধাপে আমি উঠে গিয়েছি শেষ চূড়ায় যেখানে রয়েছে নবজন্ম। সমস্ত অতীতের যতটুকু এখনো অবশিষ্ট তা হল বিপুল এক প্রেমাবেশ, তা আমায় দিয়েছে শিশুর নির্ম্মল হৃদয় আর দেবতার ভার-হারা মুক্তচিন্তা।"[১৭১]

ঠিক এর পরের "ধ্যান ও প্রার্থনা" হল পণ্ডিচেরী থেকে

১৭০। Prayers and Meditations p. 291

১৭১। Prayers and Meditations p. 292

২২শে জুন ১৯২০ সালে। শ্রীমা শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে অবস্থান করতে এলেন, তাতে তাঁর "সন্তানেরা" খুবই খুশী এবং গুরুদেব আশ্বাস দিলেন যে তাঁরই কর্ম্মৈষণার উদ্দেশ্য শ্রীমাকে আকর্ষণ করে এসেছে। ঠিক এই দিব্যকর্ম্মের জন্যই তাঁকে বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে নিয়ে আসা, ক্রমে গড়ে তোলা ও দীর্ঘ বৎসর ধরে আত্ম-কর্তৃত্ব ও আত্ম-শুদ্ধির ক্রমোন্নতির জন্যে শিক্ষা প্রদান। মনে হয় যেন শ্রীমা ঠিক এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যই জগতে আবির্ভূতা এবং ধীরে ধীরে তাঁর দেবত্বকে সংযত করে বিবর্ত্তনের ধারার পথে নামভূমিকায় প্রধানার কাজ করে যাবেন ; এর প্রমাণ রয়ে গেছে শ্রীমার ২২শে জুন ১৯২০ সালের লেখাতে—"কোন ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, করুণা করে তুমি আমায় দিয়েছিলে এমন আনন্দ, হে আমার দয়িত ভগবান ; এখন তুমি দিয়েছ আবার পরীক্ষা, যুদ্ধ, কিন্তু একেও আমি হাসিমুখে গ্রহণ করেছি, তোমার মহান বার্ত্তাবহরূপে। একদিন ছিল যখন সংঘর্ষকে আমি ভয় করতাম—শান্তির উপর সম্মেলনের উপর আমার যে আন্তরিক অনুরাগ তা ব্যাহত হয় বলে। কিন্তু এখন, ভগবান, আমি ওকে সানন্দে বরণ করে নিয়েছি...।"[১৭২]

কর্ম্মবহুল জীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর প্রথম দিকে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গী ছিলেন মাত্র চার পাঁচজন, যারা আজীবন আনুগত্যের রেশমী সুতার বন্ধনে বাঁধা ছিলেন, যে সম্পর্কের তুলনা অতি বিরল। একে একে অনেকেই পণ্ডিচেরী মুখে

১৭২। Prayers and Meditations p. 272

আকর্ষিত হলেন এবং তাঁরা সকলেই শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্ম পথ অনুসরণ করতে লাগলেন; "আর্য্য" পত্রিকার বাণী ও তার অন্তরালে যে ব্যক্তিত্ব ছিল তা অনেক অধ্যাত্ম-অনু-সন্ধিৎসুকে পণ্ডিচেরীর দিকে প্রলোভিত করল। ক্রমশঃ শ্রীঅরবিন্দকে ঘিরে গড়ে উঠল একটি কেন্দ্র। ১৯২০ সালে এই কেন্দ্রে যোগ দিলেন শ্রীমা। তিনিও দেখতে পেলেন তাঁর ভগবদ্দত্ত ভবিষ্যৎ কর্ম্মধারা এবং এই সময় থেকেই শ্রীঅরবিন্দের আদেশে আশ্রম সংগঠনের দায়িত্ব ও কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করলেন স্বহস্তে। ধীরে ধীরে নব আগন্তুকের সংখ্যা বর্দ্ধিত হতে লাগল, নূতন নূতন বাসস্থানও সংগ্রহ হতে লাগল। আহারের সুব্যবস্থার জন্য, সুন্দরভাবে, স্বাস্থ্যকর-ভাবে বাস করার জন্য আশ্রমের সকলের ভৌতিক, আধি-ভৌতিক উন্নয়নের জন্য বন্দোবস্ত করার প্রয়োজনীয়তাও ঘটল। এ সব কাজের দায়িত্ব শ্রীমার হস্তে অর্পিত হল ও ক্রমশঃ কর্ম্মবহুলতার আয়তন ও জটিলতাও বর্দ্ধিত হয়ে চললো। যখন চিন্তা করি কিরূপে তিনি এ ভার বহন করে চলেছেন, কিরূপে তিনি কতকগুলি সূক্ষ্ম অদৃশ্য চক্রকে বিনা সংঘর্ষে ও একত্রে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, কিরূপে তিনি তাঁর অলৌকিক বহুবিধ একমুখিতা ও শতমুখী কর্ম্মধারাকে প্রতি-নিয়তই পুনরাবৃত্তি করেন তখন মনে হয় এ সবই আমাদের সাধারণ ধারণাশক্তির অতীত।

যখন সাধকমণ্ডলীর সংখ্যা কম ছিল তখন তারা শ্রীমার সাথে নানাবিধ মূল্যবান আলোচনায় যোগ দিত; এর উপর

তারা গুরুর সাথেও নিয়মিত পত্রালাপ বজায় রাখত। এই "আলোচনা" ও "আলাপ" গ্রন্থাকারে সংকলন করে স্বয়ংপূর্ণ "মায়ের আলাপ" নামে অভিহিত হয়েছে—এটি শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার পূর্ণযোগের এক সহজ ও প্রত্যয়জনক অবতরণিকা। কোন কোন গূঢ় রসাত্মক "মাতৃবাণী" জ্বলন্ত চিত্রের মত পরিবেশিত রয়েছে যার মধ্যে তাঁদের যোগসাধনার মূল সূত্রটি উদ্ভাসিত, যেমন :

"সুখই জীবনের লক্ষ্য নয়।
সাধারণ জীবনের লক্ষ্য হল আপন কর্ত্তব্যসাধন ;
আধ্যাত্মিক জীবনের লক্ষ্য হল ভগবৎ-উপলব্ধি।"[১৭৩]

"ভগবৎ চেতনায় লুপ্ত হয়ে যাওয়া আমাদের লক্ষ্য নয় :
আমাদের লক্ষ্য হল দিব্য চেতনাকে জড়ের মধ্যে অনুপ্রবেশ ও রূপান্তরিত করতে দেওয়া।"[১৭৪]

এই "মায়ের আলাপ"-এর বিষয় ক্ষেত্র বিস্তৃত, তার নানাবিধ বক্তব্যের কতকগুলি হল : যোগের প্রস্তুতি ; অলৌকিক দর্শন ও আধ্যাত্মিকতা ; জোয়ান অব আর্কের অলৌকিক দর্শন ; ধ্যান ও সমর্পণ ; মুক্তি ও অদৃষ্টবাদ ; আসুরিক শক্তি ; যুক্তি ও বিশ্বাস ; রক্তশোষক বাদুড় ; চিন্তার শক্তি ; আত্মিক জগতের সর্ত্তাবলি ; মানবীয় ও ভগবৎ-প্রেম ; ধর্ম্মের প্রকৃত রূপ ; যৌগিক চেতনা ; শিল্পকলা

১৭৩। Words of Long Ago p. 22

১৭৪। Words of Long Ago p. 82

ও যোগ ; সমর্পণ ও যজ্ঞ, ইত্যাদি। সুপরিচিত, বন্ধুবৎ, কথোপকথনছলে এই যে সব শ্রীমায়ের কথা তা আমাদের অন্তরে ধীরে ধীরে ও অকাট্যভাবে আলাপের অর্থটি চিরতরে পৌঁছে দেয়। প্রমাণ স্বরূপ ব্যাখ্যাপূর্ণ তুই একটি বাক্যের উল্লেখ করা যায় এখানে,—"প্রেম সে এক পরমাশক্তি, অনন্ত চেতনা যাকে পৃবিবীর তমসাচ্ছন্ন ও নিবিড় অজ্ঞানতার মাঝে নামিয়ে দিয়েছেন যাতে সে আবার পৃথিবী ও তার সব জীবদের ভগবানের দিকে পুনরুত্থিত করতে পারে। জড়জগৎ তার অন্ধকার ও অজ্ঞানতার মাঝে ভগবানকে বিস্তৃত করে ফেলেছে। প্রেম স্পর্শ করল তিমিরকে, জাগিয়ে তুলল তাদের সকলকেই যারা ছিল ঘুমিয়ে, রুদ্ধ কানের আবরণ দিল খুলে, আর বলল তাদের কানে কানে—'এমন একটা কিছু আছে যার জন্য সজাগ থাকা, বেঁচে থাকার মূল্য আছে, সে হল প্রেম।' আর সেই প্রেমের জাগরণে ভগবানের কাছে প্রত্যাবর্ত্তন করার সম্ভাবনাও অনুপ্রবিষ্ট হল। সৃষ্টির এই যে উর্দ্ধ গতি সে তো হল ভগবানের উপর ভালবাসার মাধ্যমেই। তারই প্রত্যুত্তরে ভগবৎ-প্রেম ও করুণা পৃথিবীর উপর প্লাবিত হল সৃষ্টির সাথে মিলন-অভিসারে।"[১৭৫]

"শিল্পকলার সুশৃঙ্খলার মাঝে যে মৌলিক আদর্শ আছে, তা যোগের সুশৃঙ্খলারই সমপর্য্যায়ভুক্ত। এ দুয়েরই লক্ষ্য হল আরও বেশী করে সচেতন হওয়া। এ দুয়েরই মাধ্যমে সাধারণ দৃষ্টি ও অনুভূতির অতীতে যা আছে তাকে দৃষ্টি ও

১৭৫। Words of the Mother pp. 144-45

অনুভবের মধ্যে আনা, আর এ সবেরই অন্তরে প্রবেশ করে তার ভিতর থেকে গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে হবে···তা যদি হয় তবে এই যৌগিক চেতনা শিল্পীর সৃষ্টিকে সাহায্য করবে না কেন?”[১৭৬]

গুরুদেবের পত্রাবলীর ন্যায় (“যোগসাধনার ভিত্তি”, “যোগের পথে আলো’, “শ্রীঅরবিন্দের পত্রাবলী” নামে যে সব পত্র পুস্তকাকারে সংকলিত হয়েছে) “মাতৃবাণী” ও দিব্য-জীবন সাধনাকে শতছন্দে ছন্দায়িত করবার আমন্ত্রণ জানায়।

চব্বিশ

শ্রীমা যখন পণ্ডিচেরীর যোগাশ্রমে যোগদান করেন তারপর প্রায় বত্রিশ বছর (১৯৬০ সালে আশ্রমবাস ৪০ বৎসর পূর্ণ হল) অতিবাহিত হল। না, এক মুহূর্তের জন্যেও না, তাঁর বিশ্বাস কখনও টলেনি। তমিস্রা যেমনি এসেছে কাছে, তেমনি দূরে সরে গিয়েছে, এবং বিলুপ্তও হয়েছে, বিশ্বাসের পথের উপর পড়েছে সন্দেহের ছায়া এবং তা-ও আবার আপনিই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে এবং নব পৃথিবী, নব স্বর্গের রচনা প্রতিনিয়তই হয়ে চলেছে অবাধে, নিঃশব্দে। মাঝে মাঝে সচরাচর নববর্ষের প্রারম্ভে, কালের সঙ্কটমুহূর্তে সারা মানবের এষণাকে প্রতিমূর্ত করে শ্রীমা “প্রার্থনা” গুলি সূত্রাকারে পরিণত করেছেন এবং এই প্রার্থনাগুলি—বিশেষ করে নববর্ষের যেগুলি—ব্যথিত মানবের আশা ও তৃষাকে

১৭৬। Words of the Mother p. 191

দিয়েছে আকার ও তীব্রতা, লক্ষ্য ও গতি। যুদ্ধের প্রাক্কালে ও অবসানে রচিত কতকগুলি প্রার্থনার ব্যঞ্জনা ও সৃষ্টিশক্তির ঐশ্বর্য্যে প্রত্যক্ষ :

"১৯৪০

এ বছর হল নীরবতার ও প্রতীক্ষার বৎসর···

হে ভগবান, আমরা যেন খুঁজে পাই আমাদের পূর্ণ অবলম্বন একান্তভাবে তোমার করুণায়।"

"১৯৪৪

হে ভগবান, পৃথিবী তোমার কাছে মিনতি জানায় যাতে সর্ব্বদাই সেই একই নির্বুদ্ধিতার মাঝে বারে বারে প্রত্যাবর্ত্তন না করে।

আশীর্ব্বাদ কর, বর দাও যেন স্বীকৃত ভুল নূতন করে পুনরাবৃত্ত না হয়।

সর্ব্বশেষ আশীর্ব্বাদ কর যেন এদের কর্ম্মাবলী সঠিক হতে পারে এবং প্রচারিত আদর্শের আন্তরিক অভিব্যক্তি হতে পারে।"

"১৬ই আগষ্ট, ১৯৪৫

তোমার বিজয়, ভগবান, তোমার বিজয় হয়েছে, সেজন্যে তোমাকে আমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।

কিন্তু এখন আমাদের প্রজ্বলন্ত প্রার্থনা উঠে চলেছে, তোমার দিকে। বিজয়ীরা জয় করে শুধু তোমারই শক্তিতে ও তোমার শক্তির দ্বারা। আশীর্ব্বাদ কর, বিজয়ের সময়ে তারা যেন তোমায় ভুলে না যায় এবং বিপদের উদ্বিগ্নতার

সময়ে তোমার কাছে যে প্রতিজ্ঞা তারা করেছিল তাও যেন রাখে। তারা তোমার নাম নিয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিল, আর তারা যেন শান্তি স্থাপনের সময়ে তোমার করুণার কথা ভুলে না যায়।"

১৯৪৭ সালে ১৫ই আগষ্টে "ভারতমাতাকে আবাহন" বিশেষ অর্থপূর্ণ;

"মা আমাদের ভারতের আত্মশক্তি মা তুমি, তোমার সন্তানদের কখন ছেড়ে যাওনি তুমি, গাঢ়তম অবসাদের দিনেও এমন কি যখন তারা তোমার কথায় কর্ণপাত করেনি, সেবা করেছে অন্য ইষ্ট, অস্বীকার করেছে তোমায় তখন পর্য্যন্ত—এখন তারা ফিরে উঠে দাঁড়িয়েছে, তাই তো এই মুক্তি-উষায়, এই দিব্য মুহূর্ত্তে যখন জ্যোতি ফুটে উঠেছে তোমার মুখমণ্ডলে, প্রণতি জানাই তোমায়। পথ দেখিয়ে নাও আমাদের—যাতে মুক্তির উন্মুক্ত প্রসার নিয়ে যায় সত্যকার মহত্তর প্রসারে, নিয়ে যায় জ্যোতি-সমূহের সম্মেলন ক্ষেত্রে, তোমার সত্যকার জীবনধারায়। পথ দেখিয়ে নাও যাতে আমরা সর্ব্বদা যেন মহৎ আদর্শের পথে দাঁড়াই, মানব-জাতিকে দেখাতে পারি তোমার সত্যকার স্বরূপ,—অধ্যাত্ম সাধনার পথে দিশারী, সকল লোকের মিত্র ও সহায়।"

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম আজ হয়ে উঠেছে পৃথিবীর ক্ষুদ্র সংস্করণ একটি। আশ্রমবাসীর সংখ্যা প্রায় ১৮০০ এবং "শ্বেত সহরটি" জুড়ে ও এমন কি তাকে ছাড়িয়ে অসংখ্য বাসভবনে তারা বাস করে।

"গোলকুণ্ডা" আশ্রমের একটি অতিথিভবন, মহাকায় ও খুবই চিত্তাকর্ষক। ছাপাখানা, দপ্তরীখানা, দুগ্ধকেন্দ্র, রুটির কারখানা, ডাক্তারখানা, গ্রন্থাগার, পাঠঘর, বিদ্যালয়···অনেক প্রাণবন্ত বিভাগের মধ্যে এগুলিও আশ্রমের সৌন্দর্য্য ও সজীবতা বৃদ্ধির সহায়তা করে।

মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী-অধ্যক্ষ ডাঃ সি, আর, রেড্ডী বলেন :

"······এই অপূর্ব্ব আশ্রমে, জীবন ও জীবন-আনন্দের সাথে আধ্যাত্মিকতা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির এক আনন্দপূর্ণ একত্বতা ঘটেছে। যেন বেদের অস্থায়ী আবাসটিকে পণ্ডি-চেরীতে পুনর্ব্বসন করা হয়েছে।

কিন্তু অপূর্ব্ব মা, জাগ্রত প্রতিভা এবং মহান প্রভু-সম্বন্ধ, অনুপ্রাণিত আত্মা : এখানেই আমরা পাই পুরুষ ও প্রকৃতির অনুভবনীয় প্রতীক, যাঁরা জীবন, আলো ও সামগ্রিক আনন্দ বিচ্ছুরিত করেছেন।···যদি কেউ মনে করে থাকেন যে পরমা শ্রীমা সন্ন্যাসীর নির্ম্মমতা এবং অবিরাম ভ্রূকুটির অনুশীলন করবেন, তা হলে তারা ভুল করবেন। তিনি সন্ন্যাসিনী নন। তিনি টেনিস খেলেন। দেবদেবীরা সর্ব্বদাই জ্যোতির্ম্ময়। এবং এই মহামিলনের উৎসবে এসে মিলেছে পুরুষ, নারী ও বালখিল্যেরা—তাদের হৃদয়ে ভক্তি, চোখে ব্যবহারে কথা-বার্ত্তায় প্রেম, আলো ও আনন্দ।"[১৭৭]

আশ্রমে রুক্ষ সন্ন্যাসীভাবের স্থান সামান্যই, প্রায় নেই

১৭৭। Mother India 3rd September 1949.

বললেই চলে। রত্নগিরির নিরালা পল্লবছায়ায় বসে সিদ্ধার্থ বুঝেছিলেন বিষণ্ণ যোগী ও ভিক্ষুদের জীবন নিরানন্দ ও অদিব্য। এরূপ স্ব-কৃত নরকের তুলনায় কবি দান্তের "ইন-ফার্ণো" যেন একটি স্বাস্থ্যনিবাস। "শ্রীমা কেন মূল্যবান ও সুন্দর পোষাক পরিহিত করেন" এ প্রশ্নের মুখে পাল্টা প্রশ্ন করে শ্রীঅরবিন্দ বলেন, "এই কি তোমার অভিমত যে ঈশ্বরের প্রকাশ হবে এ পৃথিবীতে দারিদ্র্য ও কুৎসিতের প্রতীক হয়ে?"[১৭৮] ঈশ্বর যদি পরম সত্যই হন, তাহলে তিনি পরাশক্তি, পরাজ্ঞান, আনন্দ, পরমসুন্দর; সৌন্দর্য্য ও আনন্দকে জোর করে চেপে রাখলে সত্য হারায় গূঢ় অর্থ, দীপালী তার আলোকজ্জ্বল শুভ্রতা। নিরাশাবাদীর ভাণ্ড ও চার্বাকীর কুঞ্জ দুই-ই নিয়ে যায় বিপথে। অনশন আত্মহত্যার পথ দেখায় এবং তার চেয়েও ধ্রুব বিনষ্টির দিকে ঠেলে দেয় অতিভোজন-লালসা। একমাত্র মধ্যপথটি, হিরক-খচিত মঙ্গলময় পথটি পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারে 'নিষ্কম্প কেন্দ্রের' দিকে। সত্যকার সাধকেরা চিন্তা, প্রচেষ্টা, আনন্দ এ সবই যজ্ঞ হিসাবে অর্পণ করে এবং আস্পৃহার প্রজ্জ্বলন্ত শিখায় রূপান্তরিত হয়ে কম্বুরেখা রচনা করে অরুণোদ্দীপ্ত স্বর্গে উঠে চলে। মহা আনন্দের পথ খুলে দেয় যা তা হল শান্ত প্রসারতা, প্রদীপ্ত সমতা, জীবন্মুক্তের সমৃদ্ধ প্রসন্নতা। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর অনেকগুলি পত্রে খুবই পরিষ্কার করে দেখিয়ে

১৭৮। Letters of Sri Aurobindo on The Mother, p. 152

দিয়েছেন আশ্রমজীবনে এবং বিবর্ত্তমান পার্থিব চেতনার বিরাট নাট্যশালায় দিব্যমানবী শ্রীমার ভূমিকা :

"ভগবান মানবী তনু পরিগ্রহণ করেন যা'তে মানুষ পরে দিব্য চেতনায় উঠে যেতে পারে।"[১৭৯]

"একটি মাত্র দৈব শক্তি আছে যা বিশ্বে, ব্যষ্টিতে কাজ করে চলেছে এবং সে শক্তি ব্যষ্টি ও বিশ্বেরও অতীতে। শ্রীমা এ-সবেরই জন্যে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি। কিন্তু তিনি এখানে কাজ করেন মানুষী তনু নিয়ে—এমন এক শক্তি যা আজও পর্য্যন্ত জড়জগতে প্রকট হয়নি তাকে অবতরণ করাতে, যাতে এ জীবন এখানেই রূপান্তরিত হয়।"[১৮০]

আশ্রমে যে সব শিক্ষাকেন্দ্র আছে এবং সে-সব দেখে অন্যদের মতো ডাঃ রেড্ডীও বলেছেন যে "প্রাচীন তপঃশক্তি তেজ ও আনন্দ তাদের ঘিরে রেখেছে"। শ্রীমার উদ্বুদ্ধ পরিচালনায় আশ্রমের ছেলেমেয়েদের দেহের গঠনের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন ধরনের ব্যায়াম অনুশীলন করান হয় এবং "বুলেটিন অব শ্রীঅরবিন্দ ইণ্টারন্যাশানাল সেণ্টার অব এডুকেশন" দ্বি-ভাষিক পত্রিকায় আশ্রমজীবনের নানারূপ অসামান্য কার্য্যাবলীর বিবরণী ও ছবি পরিবেশন করা হয়।

ডাঃ রেড্ডী গুরুদেব ও শ্রীমাকে পুরুষ ও প্রকৃতির প্রত্যক্ষ প্রতীক বলে অভিহিত করেছেন এবং বাস্তবিকই শ্রীমা আশ্রমে বিশ্বের আদ্যাশক্তিরই অনুরূপ স্থান অধিকার করেন।

১৭৯। Letters of Sri Aurobindo on The Mother, p. 142

১৮০। Letters of Sri Aurobindo on The Mother, pp. 6-7

যে ভাবেই হোক না কেন, সাধকের কাছে শ্রীমা হলেন পরমারাধ্যা মা, ঈশ্বরী মা; যোগাশ্রম বলতে শ্রীমা, আবার শ্রীঅরবিন্দেরও সেই আশ্রম। আশ্রম অর্থে যা-কিছু তাই-ই শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দ।

এখন অবশ্য শ্রীঅরবিন্দ সব কিছুরই অন্তরালে, আর শ্রীমা হলেন সাধক সাধিকাদের আন্তর ও বহির্জীবনের প্রত্যক্ষ পরিচালিকা। তাঁর আধ্যাত্মিক মাতৃরূপ আমাদের আর সন্দিগ্ধ করে না, কারণ শ্রীঅরবিন্দ জনৈক পত্রলেখককে এ বিষয়ে পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছেন:

"শ্রীমা ও যারা তাঁকে গ্রহণ করে এই উভয়ের সম্বন্ধ হল নিগূঢ় ও আধ্যাত্মিক মা-ছেলের; এ সম্পর্ক পার্থিব মায়ের সঙ্গে সন্তানের যা তার চেয়ে অনেক মহান; মানুষী মা যা দেন ইনি তা দেন, কিন্তু অনেক মহত্তর ভাবে এবং এর মধ্যে আছে সম্পদের অফুরন্ত···। এই যে, আধ্যাত্মিক মাতৃত্ব তা এ আশ্রমেরই নূতন সৃষ্টি নয়; এ হল চিরন্তন সত্য যাকে পাশ্চাত্য ও এশিয়া বহুযুগ আগে থেকেই মেনে নিয়েছে। পার্থিব সম্বন্ধ এবং চৈত্যপুরুষ ও আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের মধ্যে যে পার্থক্য আমি দেখিয়েছি তাও নূতন আবিষ্কার নয়; এ ভাব সর্ব্বস্থানে জানা আছে ও উপলব্ধি করা হয়েছে, সম্পূর্ণ সহজ ও সরল ভাবে সকলেই স্বীকার করে নিয়েছে।"[১৮১]

১৮১। Letters of Sri Aurobindo on The Mother, pp. 95-96

পণ্ডিচেরীর যোগাশ্রমে শ্রীমা সাধকদের যা বলতে চান তা তারা আকাশ বাতাসের পরিবেশের মধ্যেই অনুভব করে কিন্তু সে অনুভূতিকে কোনরূপ যুক্তি দিয়ে শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। কোন ক্ষণিকের অতিথির যদি চোখ, কান সক্রিয় থাকে তা হলে তিনি তা নিজেই অনুভব করতে পারবেন। যদি আমাদের কল্পিত দর্শকটি শ্রীমাকে সশরীরে দেখতে না পান কিম্বা দেখেও তাঁর মধ্যে অলৌকিক কিছু না পান, তা হলে তিনি যেন সাধকদের দিকে নজর দেন। সাধকদের শ্রীমায়ের উপর একান্ত ভক্তি—যখন তারা শ্রীমাকে দর্শন করে, প্রণাম করে, তখন তাদের মধ্যে অনেকেই এক অভূত-পূর্ব্ব প্রফুল্ল আত্ম-বিস্মৃতির ভাব প্রকাশ পায়—যে সংযত আগ্রহ ও মন্ত্রমুগ্ধ নীরবতা নিয়ে মায়ের সামনে প্রতি সন্ধ্যায় তারা ধ্যানে বসে—এ সবই আমাদের অতিথিটির চিন্তার খোরাক যোগাবে। আর চিন্তা দৈব অশ্বের মত বাহন হয়ে পৌঁছে দেবে দূর বিশ্বাসের রাজ্যে। একজন চীনা পণ্ডিত, প্রফেসর তান ইয়ুন সান, অল্প কয়েক দিন আশ্রম পরিদর্শনের পর তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন এই ভাবে:

"আশ্রমের শ্রীমা কি মধুর। তিনি যে শক্তিময়ী তা প্রত্যেকেই অনুভব করতে বাধ্য। আমি অনুভব করলাম যেন, এই যাঁর সঙ্গে কথা বলছি তিনি আত্মার সম্পর্কে আমার নিকটতম। বাস্তবিকই তিনি সকলেরই মা এবং আশ্রমে যা-কিছু রূপায়িত হয়েছে সে সবই তাঁর পরিচালনায়।"

আর একজন দর্শক, ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক, এ প্রবন্ধের লেখককে বলেছিলেন যে শ্রীমাকে প্রণাম নিবেদন করার পর তিনি হৃৎ-পুরুষের এমন প্রবল উত্তেজনা ও আনন্দ অনুভব করলেন যে সারারাত জেগে কাটাতে হল। বিশ্ব-ভারতীর ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপকও এখন আশ্রমবাসী, শ্রীশিশির কুমার মিত্র মহাশয় যখন প্রথম শ্রীমাকে দর্শন করেছিলেন ১৯৩৯ সালে তখন অভিভূত ও মোহিত হয়ে আবেগভরে লিখেছিলেন :

"তিনি (শ্রীমা) অনন্তযৌবনা ও চিরতারুণ্যের মূর্ত্ত প্রতীক। তিনি রাজরাজেশ্বরী, সবদেবতার উপাস্য তাঁর দিব্যসাথী, যিনি সর্ব্বক্ষণই আর্ত্ত সন্তানদের অভয়দান করছেন এবং তাঁর স্বর্গীয় মৃদু হাসির মধ্যে আছে তাঁকে গ্রহণ করা ও অমরত্ব লাভ করার সস্নেহ মৌন আহ্বান।"[১৮২]

শ্রীঅরবিন্দের ন্যায় তিনিও পবিত্রতম শুদ্ধতায় দীপ্ত ভক্তিমূলক কবিতা লেখার জন্য অনেককে অনুপ্রাণিত করেছেন—একজন পূণ্ণালাল, আর একজন নিশিকান্ত, একজন দিলীপ কিংবা একজন নীরদবরণ, একজন আর্জব বা আর একজন অমল—এরা সকলেই কবিতাকে মাধ্যম করে আত্ম-প্রকাশে নিযুক্ত এবং কবিতাগুলিকে শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দের চরণে অর্ঘ্য হিসাবে নিবেদন করে। পূর্ণযোগ সাধনার মূল কথা হল : "স্মরণ কর, অর্পণ কর," এই ভাবে শ্রীমার সাথে একাত্মতাই যোগের প্রথম সোপান; সবকাজ তাঁর

১৮২। Sri Aurobindo—A Homage, p. 21

ইঙ্গিতে[১৮৩] সম্পন্ন, আত্মসমর্পণ হিসাবে সব কিছুই তাঁকে অর্পণ করা হয়।

পঁচিশ

বহুদিন আগে ১৯১২ সালে শ্রীমা লিখেছিলেন "জড় প্রকৃতির রূপান্তর ও সৌষম্য ঘটান যেতে পারে দুটি উপায়ে, সে-দুটি দেখতে যদিও সম্পূর্ণ বিপরীত, তবু তাদের একসঙ্গে হতে হবে—পরস্পরের উপর কাজ করতে হবে, পরস্পরের প্রতিপূরক হয়ে।

(ক) ব্যষ্টিগত রূপান্তর, এক আন্তর বিকাশ যা নিয়ে যাবে দিব্য সান্নিধ্যের ভিতরে।

(খ) সমাজগত রূপান্তর, এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি যা হবে ব্যষ্টির প্রস্ফুটন ও উর্দ্ধায়নের অনুকূল।

যেহেতু পরিবেশ ব্যষ্টির উপর প্রতিক্রিয়া করে আর

১৮৩। শ্রীঅরবিন্দের কোন কোন চিঠিতে আশ্রমে শ্রীমার স্থান সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। কোন একজনের কাছে তিনি ঘোষণা করলেন যে "শ্রীমায়ের চেতনা ও আমার চেতনা এক, একই দিব্য-চেতনার দ্বৈত প্রকাশ, কারণ লীলার জন্যে তা প্রয়োজন," আর এক চিঠিতে তিনি বলেছেন যে সাধকদের, শ্রীমায়ের কাছ থেকে আলো ও শক্তি গ্রহণ করার বন্দোবস্ত তিনি নিজেই করেছেন এবং "সরাসরি আমার কাছ থেকে নয়—এ ব্যবস্থা যে আমি করেছি তা কোন ক্ষণস্থায়ী উদ্দেশ্য নয়, বরং এই—এ একমাত্র কার্যকরী সত্য।" (Letters of Sri Aurobindo on The Mother, pp. 10-11)

অপরপক্ষে পরিবেশের মূল্যও নির্ভর করে ব্যষ্টিজীবনের মূল্যের উপর, তাই দুটিরই কাজ চলবে যুগপৎ ও পাশা-পাশি।"[১৮৪] এ সব প্রতিপূরণ প্রতিক্রিয়াগুলি শুরু করতে, তাদের কার্য্যকরী করতে, শাসনাধীনে আনতে ও সুসংবদ্ধ করে তুলতে পারার আগে শ্রীমার হয়তো কয়েক বৎসরই কেটে গেল। শ্রীঅরবিন্দ শ্রীমার স্থায় দুজন অপূর্ব্ব শক্তিশালী আধ্যাত্মিক শক্তিকে একত্র হতে হয়েছিল প্রথম ১৯১৪ সালে ও দ্বিতীয়বার ১৯২০ সালে এবং দুজনেই দিব্য-জীবনের মহিমান্বিত প্রাসাদের ভিত্তি স্থাপন, ভিত্তির উন্নতি সাধন ও নির্ম্মাণের জন্য যেন পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত। তাঁদের পূর্ণযোগের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল "এক আন্তর আত্মোন্নতি যার দ্বারা যে কেউ এই পথ অনুসরণ করে থাকে সেই-ই কালে অদ্বিতীয় সদবস্তুকে প্রত্যেকের মধ্যে আবিষ্কার করতে পারবে এবং মানসচেতনার চেয়ে এক উর্দ্ধতর চেতনার বিবর্ত্তন হবে যা হল আধ্যাত্মিক, যা সেই অতিমানস চেতনা যে মানস প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করে দিব্যে পরিণত করবে।"[১৮৫] পণ্ডিচেরীর আশ্রমকে নিঃসন্দেহে বলা যায় একটি প্রধান বীক্ষণাগার যেখানে বিরাট গবেষণা চলছে। একভাবে বিশ্বটাই শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের অন্তর্গত বলা যায়। শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দের কাছে কত অদৃশ্য হাত প্রসারিত হয় পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে, তারা শুধু ডাকে, নৈরাশ্যের সঙ্কেত পাঠায় বারে বারে এবং

১৮৪। Words of the Mother, p. 2

১৮৫। Sri Aurobindo and His Ashram, p. 62

তাদের নিবেদন যদি আন্তরিক ও জরুরী হয় তখনই এঁদের কাছ থেকে সাড়াও পাওয়া যায় সুনিশ্চিত ও অব্যর্থ-ভাবে।[১৮৬]

শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা উভয়েই আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন এই বলে যে আসল কাজ শুরু হয়েছে মাত্র। অতি-মানসের অবতরণ, মানবের দেবত্বলাভ, জড়প্রকৃতির অতি-প্রাকৃতে রূপান্তর—এ সবই অভিপ্রেত ; এর চেয়ে বেশী কিছু বলা বিপজ্জনক। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, "একান্ত নিঃসন্দেহে আমি জানি অতিমানস শক্তি হল এক সত্য, প্রকৃতির প্রতিটি স্তরে তার আবির্ভাব অনিবার্য। প্রশ্ন হল শুধু কবে ও কি ভাবে। তাও ঊর্দ্ধের কোন এক স্তর থেকে সঙ্কল্পিত ও সুনির্দ্দিষ্ট হয়ে আছে ; কিন্তু এখানে বিরুদ্ধ শক্তির কঠিন বিরোধিতার মধ্য দিয়ে তাকে সংগ্রাম করতে হচ্ছে।...... তবে এ নিশ্চিত যে অনেক পুণ্য আত্মাকে এ জগতে পাঠানো হয়েছে যাতে এখনই এখানে সে-রূপান্তর কার্য্যকরী হয়। এই হল অবস্থা। আমার বিশ্বাস ও ইচ্ছা হল এখনই হোক এর সংসিদ্ধি"।[১৮৭] নূতন সমন্বয়ের মধ্যে জড় ও আত্মার দুই শ্রেণীকে গ্রহণ করে নিতে হবে, আবার অতিক্রমও করতে হবে তাদের :

১৮৬। cf. K. D. Sethna's 'A Personal Preface" to his Adventure of the Apocalypse

১৮৭। Letters of Sri Aurobindo (2nd series) pp. 67-68

ওই দেখ, ঈশ্বরের দুটি বিশাল জগৎ—
আত্মা ও অনুভূতির—
তাদের পরিণয় হল
এই সঙ্কীর্ণ বাসর-সজ্জায় ;
হ্যাঁ, ক্ষুদ্র পতঙ্গের গুঞ্জন উঠল
দেবদূতের উত্তর নিয়ে
তোমার দেহের প্রাঙ্গণ পার হয়ে। ১৮৮

এ ভাবে মনকেও অতিক্রম করতে হবে এবং এক নূতন তত্ত্বকে—অতিমানস শক্তিকে—অবতরণ করাতে হবে ও তাকে জড় চেতনার সাথে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে বাঁধতে হবে। এ কি মিথ্যা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয় ? অসুরেরা বিজয়ী, আর দেবতারা পশ্চাদপসরণই করে চলেছে। "বিশ্বাস ফুরিয়ে গিয়েছে, কৃতজ্ঞতার জন্ম হয় নি" ; ক্ষুদ্র বৃহতের দায়িত্ব পালন করে চলেছে ; পশ্চাদপসরণই হল কালের নীতি। কিন্তু শ্রীমার আকাশভেদী বাণী উঠেছে দ্বিধাহীন নির্ভীক

"এগিয়ে চল, এগিয়ে চল নিরন্তর।
সুড়ঙ্গের শেষপ্রান্তে আছে আলো…
যুদ্ধের অন্তে বিজয়।"

শেষ অধ্যায়

পূর্বের অধ্যায়গুলি লেখা হয়েছিল ১৯৪৯ সালে নভেম্বর মাসে এবং যদিও তারপর মাত্র দুটি বছর কেটে গিয়েছে কিন্তু

১৮৮। Francis Thompson

তারই মধ্যে শ্রীমার বিস্তীর্ণ কর্ম্মরাজি আশ্রমে ও তার বাইরে আরো প্রসারিত ও প্রশংসিত হয়েছে। তবে এরি মাঝের একটি ঘটনা সারা বিশ্বকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করেছে। ৫ই ডিসেম্বর সকালে খবর ছড়িয়ে পড়ল আকাশে বাতাসে শ্রীঅরবিন্দের মহাসমাধির। অদৃষ্টের কঠোর পরিহাস যা তা "সাবিত্রী"তে পূর্ব্বেই বলা ছিল, অবশেষে তার বিকাশ হল এই মর্ত্ত্যে :

অনন্ত নিশীথের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে তাকে,
যেমন জানে তার সূর্য্যকে তেমনি জানতে হবে
বিধাতার অন্ধকারকে
এরই জন্যে গহ্বরের তলায় নেমে যেতে হবে তাকে,
এরই জন্যে সে দুঃখের অসীম দুর্গ সব আক্রমণ করবে।
অক্ষয়, জ্ঞানী, অসীম
মর্ত্তকে ত্রাণ করতে সে নরকেও প্রবেশ করবে।
শাশ্বত জ্যোতি নিয়ে আবির্ভূত হবে সে
যেখানে বহু বিশ্বের সীমানা এসে মিশেছে...
তখন উৎপাটিত হবে সব যাতনার মূল...
এ মরজীবন হবে অসীমের আনন্দ-নিবাস।
অন্নময় পুরুষ পাবে অমৃতের স্বাদ
বিশ্বত্রাতার তখনি হবে কর্ম্মের সমাপ্তি। [১৮৯]

শীতের সম্ভারের আপাত প্রত্যাহারের পর পূর্ব্বনির্ধারিত সমৃদ্ধ বসন্তের পদক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী। তবুও সাধারণ মানুষ এ

১৮৯। Savitri—Book VI, Canto 2.

ঘটনাটির নিজের মতন অর্থ অনুমান করে নিল, শোকান্বিত হতবুদ্ধিও পরে শান্ত হয়ে উঠল—কিন্তু একেবারে আশ্রমের মধ্যে এক স্বচ্ছ নিস্তরঙ্গ ভাব ছিল। যদিও আপাত দৃষ্টিতে জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হয়েছিল রাত ১-২৬ মিনিটে, কিন্তু কয়েকদিন শ্রীঅরবিন্দের দেহ নিশ্চল হয়ে ছিল, "বিজয়ের শান্তির বিশালতা নিয়ে, যা সহস্র সহস্র দর্শানার্থী দর্শন করেছিলেন।"[১৯০] শ্রীমা ঘোষণা করলেন যে "শ্রীঅরবিন্দের দেহ অতিমানস-জ্যোতির বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত এবং পচনের কোন চিহ্নই নেই," তাই প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিকে বাহ্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যাহত করা হয়নি। ৯ই ডিসেম্বর বিকাল ৫টার সময় শ্রীঅরবিন্দের দেহ আশ্রমেরই প্রাঙ্গণে সমাধিস্থ করা হয়েছিল।[১৯১]

মানুষ অদম্য শোকে শোকাতুর যখন তখন শ্রীমায়ের সান্ত্বনাপূর্ণ এই সব বাণী এসেছিল নব-জীবন-দীপ্তি সঞ্চারণ করে। ৭ই ডিসেম্বর বললেন ঃ

"ভগবান আজ প্রাতে আমায় কথা দিয়েছ নিশ্চয় করে,

১৯০। K, D. Sethna's "The Passing of Sri Aurobindo" p. 5

১৯১। লেখক নীরদবরণের "শ্রীঅরবিন্দ ঃ এই যে আমি এখানে, এই যে আমি এখানে" ও কে, ডি, সেঠনার "শ্রীঅরবিন্দের মহাসমাধি ও নিগূঢ় তথ্য ও পরিণতি" শীর্ষক বই দুইখানির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, ঘটনাটির মানবিক ও বিশ্বজনীন পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ণ অর্থের জন্যে।

যতদিন তোমার কাজ পূর্ণ না হবে ততদিন তুমি থাকবে আমাদের কাছে, শুধু দিশারী আলোকারী চৈতন্যরূপে নয়, তুমি উপস্থিত থাকবে কর্ম্মেরও মধ্যে জাগ্রতভাবে। অভ্রান্ত কথায় তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তোমার সবখানি থাকবে এখানে, পৃথিবীমণ্ডল পরিত্যাগ করবে না যতদিন পৃথিবী রূপান্তরিত না হয়।"

৯ই ডিসেম্বর বললেন :

"হে, আমাদের ভগবানের জড় আবরণ, তোমাকে আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি। তুমি যে আমাদের জন্য এত করেছ—এতখানি কাজ করেছ, যুদ্ধ করেছ, কষ্ট করেছ, আশা করেছ, সহ্য করেছ, তুমি যে সব কিছু সঙ্কল্প করেছ, চেষ্টা করেছ, তৈরী করেছ, সংসিদ্ধ করেছ আমাদের জন্য ; তোমার সম্মুখে প্রণত আমরা, আর এই প্রার্থনা তোমার কাছে, আমরা যেন কখন ভুলে না যাই, এক মুহূর্ত্তের জন্যেও, তোমার কাছে সবকিছুর জন্যে কত আমরা ঋণী"।

১৪ই ডিসেম্বর আবার জানালেন :

"শ্রীঅরবিন্দের জন্য শোক করা অর্থ শ্রীঅরবিন্দকে অপমান করা—তিনি এখানে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে জাগ্রত জীবন্ত।"

এবং ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৫০ সালে বললেন :

"আমরা তাঁর সান্নিধ্যে দাঁড়িয়ে, যিনি আপন স্থূল জীবন বলি দিয়েছেন তাঁর রূপান্তর কাজটি আরো পূর্ণতরভাবে সম্পন্ন করবার জন্যে।

তিনি সর্ব্বদা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, জানছেন আমরা কি করি, জানছেন আমাদের প্রতিটি চিন্তা, প্রতিটি অনুভব, প্রতিটি কর্ম্ম।"

শ্রীঅরবিন্দ কথা দিয়েছেন নিশ্চয় করে, যখন তিনি ছিলেন "দৃষ্টতঃ" আমাদের সঙ্গে, যে তাঁর এবং শ্রীমায়ের চেতনা এক ও অভিন্ন এবং বাস্তবিকই যদি "কেউ শ্রীমার চেতনা অন্তরে অনুভব করে তবে তার জানা উচিত যে তার পিছনে আমিও আছি।"[১৯২]

সেই এক জ্যোতিকে অবতরণ করাবার জন্য যত সব বিরুদ্ধ তামসী শক্তির বিরুদ্ধে যে একক সংগ্রাম শ্রীমা চালিয়েছেন সে দৃশ্য সব প্রত্যক্ষবাদী মনের কাছে দিব্য-সংগ্রামের প্রতিরূপ পরিগ্রহ করে, যে সংগ্রামের কথা গুরুদেব নিজেই ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন নিম্নলিখিত প্রচণ্ড নগ্নতা ও প্রদীপ্ত বাণীর মারফতে :

এ বিরাট বিশ্বে একলা দাঁড়িয়ে
নীরব আত্মার প্রবল এষণায়
মূর্ত্তত্যাগী অন্তরাত্মার তীব্র আবেগে
নিঃসঙ্গ এক সে-ই তার কর্ম্মের যোগ্য।[১৯৩]

শ্রীঅরবিন্দের এই আপাত "প্রত্যাহার" এক অদ্ভুত ফলে পরিণত হয়েছে যা তাঁর অপূর্ব্ব উপস্থিতির বাস্তবতাকে আরও প্রকট করে তুলেছে। নীরদবরণ লিখলেন এই প্রসঙ্গে :

১৯২। Letters of Sri Aurobindo on The Mother, p. 20

"শ্রীঅরবিন্দের সমাধিবক্ষ বিদীর্ণ করে আগুনের সহস্র জিহ্বা উঠেছে, চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে আশ্রমকে আবৃত করে, তা প্রত্যেক সাধকের বক্ষে জ্বলছে এক অনির্ব্বাণ ঊর্দ্ধমুখী আহ্বানে। আর শ্রীমার অন্তর ও বাহির ঘিরে, চেতনায় প্রদীপ্ত হয়ে, দেহে এক হয়ে রয়েছে তাঁর বিদেহ। শুনতে পাই আমরা তাঁর সদা-জাগ্রত নিঃশব্দ পদসঞ্চার এ মাটিতে, দেখতে পাই তাঁর উজ্জ্বল স্বুবর্ণ দেহ, শুনতে পাই তাঁর মৃদু গম্ভীর ভাষা।"[১৯৩]

ইতিমধ্যে রূপান্তরের কাজ অবিচলিতভাবে এগিয়ে চলেছে: শ্রীমায়ের শক্তি এখন পৃথিবীতে নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের যে সহস্রাধিক কর্ম্মাবলী তার উপর পূর্ব্বের চেয়েও সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত। আশ্রমের নানাবিধ কার্য্যাবলী ও শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের আদর্শানুযায়ী পূর্ণযোগের পথানুসরণের সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক "বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র" সংগঠিত হচ্ছে এবং তাঁর দ্বারা পরিচালিতও হচ্ছে।

২৪শে এপ্রিল ১৯৫১ সালে শ্রীঅরবিন্দ স্মৃতি সম্মেলনে শ্রীমা বাণী দিলেন:

"শ্রীঅরবিন্দ আমাদের মধ্যে উপস্থিত এবং এই বিশ্ব-বিদ্যালয় কেন্দ্র স্থাপনে তিনি তাঁর সমগ্র সৃজনী শক্তি দিয়ে পৌরহিত্য করছেন এবং তিনি বহুদিন ধরে স্থির করেছিলেন যে এরূপ কেন্দ্রই প্রস্তুতির একমাত্র উপায় যার দ্বারা সমগ্র

১৯৩। "Sri Aurobindo : I am here, I am here" p. 24

মানবজাতি অতিমানস জ্যোতিকে গ্রহণ করতে পারে, যে জ্যোতি মানবসমাজের প্রবুদ্ধ মানবের রূপান্তর ঘটাবে এবং যা সৃষ্টি করবে এক নব জাতি, প্রকাশ করবে এক নব জ্যোতি, শক্তি ও জীবন।”

পণ্ডিচেরীতে বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রের উদ্বোধন শ্রীমা করেছেন এবং এই নূতন শিক্ষার গবেষণার কাছেই মানুষের আকাঙ্ক্ষিত অতিমানস রূপান্তর লাভের চাবিকাঠি। এখানকার পাঠক্রমে কিছু বাদ নেই বা ভ্রান্ত একদেশদর্শিতা নেই; কলাবিদ্যা ও বিজ্ঞানের মধ্যে অযথা পরস্পরবিরোধ ভাবের আনুকূল্যও নেই; তবুও তারা পরস্পরে অখণ্ডভাবে অবিচ্ছিন্ন এবং এখানে যে শিক্ষা দেওয়া বা নেওয়া হয় তা আধুনিক নির্লজ্জ ব্যবসায়ী ভাবাপন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের চেয়ে অনেক উন্নততর প্রকৃতির। বুদ্ধিগত ও বিজ্ঞানগত নিয়মানুবর্ত্তী অনুশীলন থাকবেই; আবার কলাবিদ্যার মানুষীকরণের প্রভাবও থাকবে; তবে সকলে একযোগে শ্রীঅরবিন্দ উৎস থেকে আকণ্ঠ পান করে আত্মার প্রসারতা ও সৃজন-শীল একত্বতার বৈশিষ্ট্য উপভোগ করবে। নলিনীকান্ত গুপ্তের ভাষায় বলা যায় যে এ বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রের উদ্দেশ্য হল “পৃথিবীতে নূতন মানবের প্রস্তাবনা—নূতন জীবন, নূতন চেতনা নিয়ে। এ সব কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব এবং সম্পন্নও হবে এ প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে। শ্রীমা আমাদের মধ্যে আবির্ভূতা, তিনিই প্রতিশ্রুতির সার্থক পরিপূর্ণতা দান করবেন।” ব্যর্থতার দীর্ঘ রাত্রি নিশ্চয়ই শীঘ্র সমাপ্ত হবে:

অধস্তন জ্ঞানের অর্দ্ধ-আলো উর্দ্ধতার শুভ্র দীপ্তির দ্বারা অতি-ক্রান্ত হবে ; তারপর শক্তি জ্ঞান সৌন্দর্য্য ও আনন্দের সাথে মিশে হবে দ্বিগুণ বর্দ্ধিত :

এ ভাবে মর্ত্ত নিজেকে খুলে ধরবে দেবতার কাছে
এবং সাধারণ প্রকৃতি বিরাট উর্দ্ধায়ণ অনুভব করবে ;
সাধারণ কর্ম্ম আত্মার দীপ্তিতে হবে উদ্ভাসিত
এবং ইষ্টকে দর্শন করবে সাধারণ বস্তুর মাঝে।
প্রকৃতির অস্তিত্ব হবে গুপ্ত দেবতাকে প্রকাশ করতে,
আত্মা গ্রহণ করবে মানবলীলা
এই মর্ত্ত্য জীবনই হবে দিব্য-জীবন।[১৯৪]

১৯৪। Savitri Book XI, Canto 1